তৃতীয় অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা

দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাসে ঘটনার দিকে নজর দেননি। বরং চরিত্রের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূতির জগৎটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্র নির্মাণের সময় তাই সমাজের প্রতিটি শ্রেণির ক্ষেত্রেই তিনি উৎসুক। একেবারে অতিতুচ্ছ সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত, সচ্ছলতা সন্ধানী মধ্যবিত্ত কিংবা হৃদয়হীন উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে বস্তিবাসী পরিচারিকা, সরকারি-বেসরকারি অফিসের মেজকেরানি, রাজনীতি করা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক কিংবা কোম্পানি-ফার্মের ডিরেক্টর, বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মচারী— এদের সকলকেই দিব্যেন্দু পালিত নিজ অভিজ্ঞতায় নির্মাণ করেছেন। তবে বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো— ১. উপন্যাসের প্রধান চরিত্রচিত্রণ এবং ২. উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রচিত্রণ।

১. উপন্যাসের প্রধান চরিত্রচিত্রণ :

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে দুটি ভাগে করে আলোচনা করা হলো— (ক) প্রধান নারী চরিত্র এবং (খ) প্রধান পুরুষ চরিত্র।

১. ক. প্রধান নারী চরিত্র :

অরুন্ধতী :

'সিন্ধু বারোয়াঁ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং নায়িকা অরুন্ধতী। সে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সে এক বছরের সিনিয়র ইংরেজি বিভাগের ছাত্র সৌম্যর প্রেমে পড়ে। কিন্তু সেই প্রেম বেশিদিন টেকেনি। তার বাবা চাকরিজীবী ছেলে বিভাসের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। সৌম্যকে বিয়ের কথা বললেও সৌম্য নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবে। সে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায়। প্রেমে প্রত্যাখ্যান অরুন্ধতী মেনে নিতে পারেনি। ফলে বিবাহ জীবন তার সুখের হয়নি। সৌম্যর উপর ওঠা তীব্র রাগ-অভিমান সে স্বামীর উপর দেখায়। ফুলশয্যার রাত থেকে আলাদা বিছানায় শোয়। সৌম্যকে না পেয়ে স্বামীকে যতোটা না কষ্ট দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে নিজে। পাড়ার বখাটে ছেলে সুনীলকে ঘৃণার চোখে

দেখলেও সেই ঘৃণাকে অবলম্বন করে ক্রমশ সে নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। যাকে একপলক দেখলে ঘৃণা হতো, তার সঙ্গেই সে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে অরুন্ধতীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সবার সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারেনি। সবসময় একা একা থাকে, একলা মনে ভাবতে থাকে। পৃথিবীর সব কিছু তার কাছে অসাড় মনে হয়। কিছুদিন পর সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। পেটের ভিতরের অঙ্কুরটার কথা ভেবে ভয় পায়। যদি অঙ্কুরটি বিভাসের মতো না হয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো হয়। মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে গিয়েও একটা মমতা এসে পড়ে।

অরুন্ধতী নবজাত সন্তানকে সহ্য করতে পারেনি। হাসপাতালের নার্স থেকে বাড়ির কাজের ঝি সকলেই সন্তানের আকারগত সাদৃশ্য না থাকায় প্রশ্ন তুলে। তীব্র জ্বালায় জ্বলতে থাকে সে। সন্তানের কান্না তার কাছে 'জানোয়ারের মতো অলুক্ষণে চিৎকার' মনে হয়। বিভাসের অলক্ষ্যে নিজের হাতে সন্তানের শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং নিজেও কিছুদিন পর আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কুড়ি বছর বয়সে লেখা এই উপন্যাসটিতে লেখক চরিত্রচিত্রণে সেরকম দক্ষতা দেখাতে পারেননি। উপন্যাসটিতে কাহিনি যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, চরিত্রেরও তেমন বিকাশ ঘটেনি।

এষা :

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীশিক্ষার অগ্রগতির ফলে মেয়েরা আর চার দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ থাকতে চায়নি। বেরিয়ে এসেছে বদ্ধ ঘরের আগল ভেঙে। নিজের মন মতো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে না দিলে তারা ঘর-সংসার করতে রাজী হয়নি। পারিবারিক-সামাজিক বাধাকে তোয়াক্কা না করে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। নিজের মন মতো প্রেমিক পুরুষ খুঁজে নিয়েছে। সেই প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে যদি মনের মিল না হতো তাহলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে একাই থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুক্তি খুঁজেছে পুরুষের বন্ধন থেকে। দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর এরকমই একটি নারী চরিত্র এষা। নিজের অমতে

অল্প বয়সে বিয়ে দেয় বাড়ির লোকজন। তারা ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু বাসররাতেই এষার স্বামীস্পর্শ সহ্য হয়নি। তার মনে হয়েছিল—

> "মৃণালের দৃষ্টিতে বন্য ক্ষুব্ধ, নাকের পাটা অস্বাভাবিক স্ফীত।... মৃণালের নিশ্বাসের বিষ, গালে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে যেন।"[১]

এষার স্বামী মৃণাল বড়ো চাকরিজীবী, বিদেশে থাকে। এষাকে নিয়ে যেতে চায় বিদেশে। এষা চায় এদেশে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এষা নতুন করে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সহপাঠী অমলেন্দুকে সে ভালোবেসে ফেলে। অমলেন্দুকেই তার মনের মতো পুরুষ মনে হয়। গভীর নিশুতি রাতে অমলেন্দুর কথা ভেবে অনুকম্পা জেগে ওঠে তার শরীরে। অনেকবার অমলেন্দুর সঙ্গে শরীরী খেলায় মেতে সুখ পায় সে। অমলেন্দুকে বিয়ে করতে বলে। সামাজিকতায় তার বিশ্বাস নেই। ন্যায়-অন্যায় সে ভালো করেই বোঝে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে নিজের আত্মাকে সে বিক্রি করে দিতে চায়নি। সে জানায় মৃণালকে ডিভোর্স দেবে।

মৃণাল বিদেশ থেকে ফিরে এলে এষাকে নিয়ে যেতে চায়। এষা রাজি হয়নি। সে শ্বশুরবাড়ি স্বামীর ঘর করতে যায়নি। বাড়িতে এসব নিয়ে মা, দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে এষা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। স্থির করে একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকবে। আর অমলেন্দুর জন্য অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু অমলেন্দু তার প্রেমের মর্যাদা দিতে পারেনি। বিয়ের কথা শুনে অমলেন্দু পিছিয়ে গেছে। অমলেন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। পারেনি বিবাহিত মেয়েকে বিয়ে করতে। প্রেমের দিক থেকে মেয়েরা বেশি সাহস দেখিয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। এষার মনে হয়েছে সব পুরুষই এক। সবাই শুধু শরীরকে চায়, মনকে কেউ চিনতে পারে না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে এষা ভয় পায়। দুই পুরুষ— স্বামী আর প্রেমিকের টানাপোড়েনে সে ক্ষতবিক্ষত হয়, আত্মদ্বন্দ্বে ভুগে। দুটি পরস্পর বিপরীত ধারণার জন্ম হয় তার মনে। প্রথমে তার স্বামী মৃণাল সম্পর্কে—

> "আমি কেন মৃণালকে পছন্দ করতে পারলুম না! মৃণাল অভদ্র নয়, মৃণাল শিক্ষিত, ভালো উপার্জন করে; চেহারায় পৌরুষ আছে, স্বাস্থ্য ভালো।"[২]

আর প্রেমিক পুরুষ অমলেন্দু সম্পর্কে—

> "অমলেন্দুর আবেগ রয়েছে, একটু বেশিই হয়তো। অমলেন্দু ভালোবাসতে পারে প্রচণ্ডভাবে; কিন্তু আশ্রয় দিতে পারে কি? শুধুই ভালোবাসার জন্যে কেউ বাঁচতে পারে না।"[৩]

পরস্পরবিরোধী এই দুই অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তৃতীয় এক অভিজ্ঞতার, যা ক্রমাগত পারাপার করে প্রথম দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে—

> "কোনো কিছু দাবি করবার জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র আমার নেই। এই জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি চাইছি। আমি নিঃসঙ্গ হয়ে বাঁচতে পারি, কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়ে একা-একা বাঁচবার মতো মনের জোর আমার আছে কি? কিংবা, অমলেন্দু যদি আমাকে গ্রহণ করত, তার সঙ্গে যেতে পারতাম কি? একটি সমস্যা এবং আমি যেতে পারতাম না। কেন জানি না। লোকনিন্দা? হয়তো। আত্মীয় পরিজন? সম্ভবত। সংস্কার? সত্য হতে পারে। সুতরাং দেখতে গেলে, সমস্যা অমলেন্দু কিংবা মৃণাল নয়; তারা তাদের মতো, উপলক্ষ মাত্র; আমার সমস্যা আমি নিজে। আমি চাইছি; আবার একই সময়ে চাইছি না।"[৪]

এই অবস্থায় আত্মহত্যার কথা তার মনে হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হয়েছে মৃত্যু কোনো বিশেষ সমাধান নয়, মৃত্যু মানে পরাজয়, পশ্চাদ্‌সরণ। তাতে পাপ বাড়ে। সেটা সাময়িক নিবৃত্তিমাত্র। সে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস অঞ্জলিদির কাছে পরামর্শ নেয়। নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে। স্বাবলম্বী হয়ে একা একা থাকতে চায় স্বাধীনভাবে।

এই উপন্যাসটিতে লেখক এক সুন্দরী ও শিক্ষিতা আধুনিক নারীর বিদ্রোহী চেতনার ক্রমোন্মোচন দেখিয়েছেন। যে নিজেকে একটি পুরুষের যৌনতার কেন্দ্রে নিঃশেষ করতে চায়নি। যে বিবাহকে অস্বীকার করে অন্যতর সম্পর্কে মুক্তি খুঁজেছিল। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়ে অবসন্ন শূন্যতার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে মৃত্যুকে পরাজয় ভাবলো এবং পাপ আর স্মৃতিচারণের মধ্যে শুনতে পেলো প্রতিকূলতার অমোঘ কণ্ঠ— "ন চ দিন্নমাদিয়ে।"[৫]

দিব্যেন্দু পালিতের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে মেয়েরা যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার সূত্রপাত আমরা এষার মধ্যদিয়ে প্রথম পাই।

তপতী :

'মধ্যরাত' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তপতী। সে সুরমা দেবী গার্লস কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সে একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। দূর সম্পর্কের কাকার আশ্রয়ে থাকলেও কাকিমা আটাশ-ঊনত্রিশ বছরের ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েকে সহ্য করতে পারেনি। ফলে চাকরি করা সত্ত্বেও তপতীকে চলে যেতে হয় মেয়েদের থাকার আশ্রয় মেসবাড়িতে। তপতী ছিল অন্তর্মুখী স্বভাবের। জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা তার ছিল না। প্রেম, ভালোবাসা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্পর্কে সে কোনোদিন স্পষ্ট করে ধারণা করতে পারেনি। তার গতি ছিল সীমাবদ্ধ। স্কুলের সহপাঠিনীদের প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান, সম্পর্কের প্রসঙ্গে সে কাউকেই খুঁজে পেতো না। বন্ধুরা তার অনভিজ্ঞতায় কৌতুকবোধ করলেও তার মানসিকতার এই দূরত্বে সে কোনোদিন অস্বস্তিবোধ করেনি। অ্যাডাল্ট হওয়ার বয়সেও তার এ সম্পর্কে জ্ঞান হয়নি। লেখক তার সম্পর্কে জানান—

> "পরে যখন মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আঁচ করার বয়স এল, সচেতনতা দেখা দিল শরীরে, সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা তখনও মনে আসেনি।"[৬]

মেসের সঙ্গী রত্না তার এই স্বভাবের জন্য তাকে 'রেফ্রিজারেটর' আখ্যা দিয়েছে। তপতী অসহায় বোধ করলেও নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা সবসময় নিজের মনে চেপে রাখতো।

নীতীশকে ঘিরে তপতীর অবচেতন মনে প্রেমের আলোড়ন কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। নীতীশই তাকে তপতী দেবী গার্লস কলেজের চাকরিটা পাইয়ে দেয়। ফলে তপতী নীতীশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। দুজনে গল্প গুজবের মধ্যদিয়ে নিজের প্রেমের কথা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরাসরি বলতে পারেনি কেউই। নীতীশ চিঠি দিয়েছে তপতীকে। চিঠি পড়ে তপতী অস্বস্তি করলেও আত্মমগ্নভাবে ধুলোর উপর নীতীশের নাম লিখেছে। নির্জন রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হাঁটার সময় নীতীশকে এক পরম আত্মীয় মনে হয়েছে তার। নীতীশও বলেছিল, "শুধু নিজেকে নিয়ে হয়তো বাঁচা যায় না। কোথাও না কোথাও এসে আমাকে থামতে হবেই"।[৭]

আকারে-ইঙ্গিতে ভদ্ররুচির নীতীশ তাকে ভালোবাসার নিবেদন জানালেও তপতী নিজের জড়তা কাটাতে পারেনি। নীতীশের সহজ সরল আন্তরিকতার কাছে তপতী ধরা

দিতে পারেনি, পারেনি তার সান্নিধ্যে আসতে। শেষে নীতীশের বিদেশযাত্রার কথা শুনে সে একমনা হয়ে পড়েছে। যেন নীতীশের যাওয়াটা তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। অনুভূতির কোশে কোশে তা উপলব্ধি করে তপতী নিজেকে দুর্বল ও অসহায় বোধ করেছিল।

এরকম একমুখী স্বভাবের মেয়ের চরিত্র দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে খুবই কম। যেখানে এষা কিংবা নমিতারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তার পাশাপাশি তপতী অনেকটাই বেমানান। দিব্যেন্দু পালিত তাই হয়তো তপতী চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটাতে পারেননি।

নমিতা :

'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নমিতা। ছয় বছর স্বামীর সঙ্গে ঘর করে আর একসাথে থাকতে পারেনি। আইনি মতে ডিভোর্স হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ একা এবং আত্মনির্ভরহীন হয়ে পড়ে। তার নিজের কথায়—

> "আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কোনো-না-কোনো অবলম্বন নির্ভর করে থেকেছি। বিয়ের আগে পর্যন্ত বাবার কাছে, তারপর স্বামীর কাছে। পায়ের পাতা এখনও তাই খুব নরম হয়ে আছে।"[৮]

নমিতার বিয়ে হয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারে। স্বামীর ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে আসে ফ্ল্যাটে। এতোদিন নমিতা যা পায়নি, ফ্ল্যাটে এসে তার মনে হয়েছে সবকিছু নিষেধের বেড়া সে ডিঙিয়ে এসেছে। সবকিছু নিজের করে পেয়েছে, সম্পূর্ণের অধিকার অর্জন করেছে। অন্যদিকে মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধার জন্য বন্ধুবান্ধব ও মক্কেলদের সঙ্গে তাকে ঘনিষ্ঠ করাতো। মহীতোষ চাইত স্ত্রীকে সামাজিক করে তুলতে। কিন্তু এরজন্য যে স্বতঃস্ফূর্ততা যে মানসিক ঔদার্য দরকার, মহীতোষের তা ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে মহীতোষের চোখে নমিতা ব্যভিচারিণী হয়ে উঠে। নমিতাকে অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হয়েছিল— "তোমার জেদ কী করে ভাঙতে হয় জানি! বেশ্যা মাগি তোকে আমি মুরগি জবাই করব।"[৯] নমিতা এসব সহ্য করেনি। স্বামীর খারাপ ব্যবহারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অনেক সময় আত্মহত্যার চিন্তাও করেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে। মহীতোষের মতো কাপুরুষ, সন্দেহগ্রস্ত স্বামীকে সে কোনো তোয়াক্কা করেনি। একা ফ্ল্যাট

নিয়েছে। চাকরি খুঁজেছে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হারেনি। সমাজের চোখে হারলেও জীবনের কাছে হার মানেনি। বেঁচে থাকার সাধ, জীবনকে উপভোগ করার সাধ তার ফুরিয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর নায়িকা এষার কথা স্মরণ করা যায়। এষার বিদ্রোহী চেতনা আরো প্রবল ছিল।

রুচি :

সামাজিক অনুশাসনকে লঙ্ঘন করতে পারেনি 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়া এবং 'আড়াল' উপন্যাসের রুচি। এই দুটি উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নারীর সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আড়াল' উপন্যাসের রুচি শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসে তার মনে হয়েছে স্বামীসুখের অপূর্ণতা। যা পূরণ করতে চব্বিশ বছরের সংসার জীবনকে অবহেলা করে প্রেমিকপুরুষ দীপঙ্করের কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। দীপঙ্করের স্পর্শ তার কাছে মনে হয়েছে পরম আনন্দের। কিন্তু রুচির এই আশা সফল হয়নি। প্রবল সামাজিক বাঁধাকে সে লঙ্ঘন করতে পারেনি। প্রেমিকপুরুষের মোহে নিজেকে আত্মাহুতি দিতে পারেনি। নিজের কর্তব্যে সে সংযত থেকেছে। তার নিজের বিবেক তাকে পথ দেখিয়েছে, শাসন করেছে, নিজেকে আড়াল রেখেছে। তাই নিজের জরায়ু ক্যানসারেও সে স্বামীকে জানায়নি। সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে আত্মবলিদান দিয়েছিল জয়া। সে এক মধ্যবিত্ত গৃহবধূ। স্বামীর কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ও বিশ্বাস ছিল অসীম। ভারতবর্ষের সতীসাবিত্রীর মতো ছিল তার চরিত্র। স্বামীর সামাজিক অনুশাসনই একদিন তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে।

মানসী :

'সবুজগন্ধ' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র মানসী। বাবা-মার অমতে প্রেমিক দীপঙ্করের সঙ্গে সে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। সামাজিক মতে বিয়ে বিয়ে হয়নি তাদের। বাবা-মাও এর পর আর মেনে নেয়নি। বিয়ের পর মানসী এক দুরারোগ্য মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। হাসপাতালের বেডে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানসীকে দেখতে দীপঙ্কর প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে এবং যায়। বাকি সময়টা মানসী একা এবং নিঃসঙ্গে কাটায়। হাসপাতালের ঔষধিয় গন্ধযুক্ত পরিবেশ তার মনের আবেগ, ভালোবাসাকে ক্রমশ ফিকে করে দেয়। স্বামীকে সে অভিযুক্ত করে, 'যার স্ত্রীর এমন যায় যায় অবস্থা, সে কেমন করে অফিস করে'। তার বাবার কথা

মনে পড়ে। বিয়ের পর তার বাবা বলেছিল, 'আমাদের নাকি পুরো বিয়ে হয়নি। আমি নাকি তোমার পুরো স্ত্রী নই'। এসব অভিযোগ দীপঙ্করকেও মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সেও ভালোবাসার মানে ভুলে যায়। মানসী লক্ষ করে দীপঙ্করের একটু একটু করে বদলে যাওয়া।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে অস্তিত্বের লড়াই চরিত্রদের অন্য মাত্রা দিয়েছে। মানসী একটু সুস্থ হলে বাঁচার আশা দেখে। দীপঙ্করকে বলে আবার তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে দীপঙ্কর যেন এবার তাকে সামাজিক মতে বিয়ে করে। তারা নতুন করে ঘর সংসার বাঁধবে। সে দীপঙ্করের আগমনের অপেক্ষায় সবুজ পেড়ে, হলদে শাড়ি পরে হাসপাতালে সুসজ্জিত হয়ে থাকে। যাতে দীপঙ্কর আগের মতো তাকে আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে কাছে টানতে পারে।

বিশাখা ও অর্পিতা :

দিব্যেন্দু পালিত নারী চরিত্র অঙ্কনে দক্ষ কারিগর। নারী চরিত্রকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'সোনালী জীবন' উপন্যাসে সারার মধ্যদিয়ে নারীর অসহায়তার চিত্র, 'সংঘাত' ও 'অনুভব' উপন্যাসে ঋতুপর্ণা ও আত্রেয়ীর মধ্যদিয়ে নারীর বিদ্রোহী সত্তা, আবার সামাজিক অনুশাসনে বাঁধা 'আড়াল' ও 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়া ও রুচিকে অঙ্কন করেছেন। 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত এমন দুটি নারী চরিত্রকে অঙ্কন করলেন যা এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মনে রাখতে হয় এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা—

> "সময়ের অভিঘাত নয়। সময়ের প্রবর্তিত জীবনের নতুন ছাঁদ, নতুন প্রেক্ষাপট ও পটবিধৃত চরিত্র ও তাদের সংকট এ উপন্যাসে প্রধান কথা। দুটি কর্মরত জীবন জীবিকার সূত্রে নিবদ্ধ দুটি নারীর উচ্চাবত অস্তিত্বের আবর্ত এখানে প্রধান কথা। সন্দেহ নেই এও এক বিপন্ন সীমান্তের কথা।"[১০]

চাকরিজীবী মেয়ে বিশাখা ও অর্পিতা। বাবা-মা হারানো বত্রিশ বছর বয়সী বিশাখা কলেজের অধ্যাপিকা। স্বাধীন ও স্বনির্ভর মেয়ে। কিন্তু কোথায় যেন পুরুষের উপর নির্ভর তার থেকেই যায়। বাবা মারা যাবার পর নিরাশ্রয় বোধ করে। তারপর প্রেমিক পুরুষ সিদ্ধার্থের আশ্রয়ে

বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সিদ্ধার্থ বিদেশে থাকে। গত তিন বছরে মাত্র একবার দেখা হয় তাদের। আর খবর নেওয়ার জন্য একবারই একটি চিঠি পাঠায় সিদ্ধার্থ। সেই চিঠি পেয়ে বিশাখা অপমানবোধ করে। তার জন্মদিনে শুভেচ্ছাটুকুও জানায়নি সিদ্ধার্থ। এই অপমান তার মনে তীব্র মানসিক দৈন্য আর নিঃসঙ্গতা এনে দেয়। জন্মদিনে অতীতস্মৃতি বিশেষকরে বাবার কথা মনে পড়ে তার। বাবার মৃত্যুর দিনে মার অসহায়তার কথা মনে পড়ে—

> "শুধু বিষাদ জড়ানো খুব আলগা এক অনুভূতির মধ্যে বুঝেছিল, বোধহয় মেয়ে হয়ে জন্মানোর একটা আলাদা অর্থ আছে।"[১১]

বিশাখা কম কথা বলার মেয়ে। তার দুঃখ-কষ্টের কথা মেসের অন্যান্য মেয়েদের সে বলতে পারেনি। তার চেপে রাখা কষ্ট থেকে উঠে এসেছে একরকম আবেগ। সিদ্ধার্থর চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে চায় সে—

> "ও কি জানে কোনও শুভেচ্ছাহীন জন্মদিন কাটানোর মতো কষ্টকর আর কিছুই নেই, তখন বুকের ওপর কী ভীষণ ভাবে চেপে বসে মানসিক দৈন্য আর নিঃসঙ্গতার বোধ।"[১২]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে মেয়েরা আশ্রয় খুঁজেছে। সেই আশ্রয়ের প্রথম পুরুষ অবশ্যই বাবা ও তারপর প্রেমিক বা স্বামী। বিশাখা অনুভব করে মেয়েদের জীবনে বাবা একটা ফ্যাক্টর হয়তে দাঁড়ায়। বাবা একটা ছাদ, একটা আশ্রয়, স্নেহ, দুটি সতর্ক চোখের পাহারা ও নিরাপত্তা। সিদ্ধার্থকে নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বিশাখা। কেবল অতীত স্মৃতি নিয়ে সে মনের গভীরে বিচরণ করেছে। 'মনে হয় এর গভীরে কোথাও বিস্তৃত হয়ে আছে এক ভীষণ স্তব্ধতা'।

অর্পিতার চরিত্র অঙ্কনে লেখক কিছুটা মধ্যবিত্ত মানসিকার পরিচয় দিয়েছেন। অর্পিতার বয়স সাতাশ। সে স্টুয়ার্ট মর্গানে কনফিডেনসিয়াল সেক্রেটারির কাজ করে। বিশাখা বলে, "অর্পিতার স্মার্টনেসের অনেকটাই ওর চাকরির পরিবেশ থেকে পাওয়া।... কথায় কথায় ইংরিজি বলে, বলার ব্যাপারে লুকোছাপি নেই, একটু বা ঠোঁটকাটা। তবে, মনটা সাচ্চা। স্বাধীন।"[১৩]

অর্পিতার পৈতৃক বাড়ি ভবানিপুরে। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা-বৌদির সংসারে তার বনিবনা হয়নি। একসময় বৌদির মামাতো ভাই চিরজিতের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু হবু বরের অসৎ আচরণে অর্পিতা সে বিয়ে ভেঙে দেয়। বিয়ে ভাঙলেও অর্পিতা ভাঙেনি। বরং এ থেকে তার মনে এক ধরনের জোর এসেছিল। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, আশ্রয় নেয় 'দক্ষিণী' হোমে। তারপর আর বাড়ি যায়নি। কেবল মাসে মাসে মাকে টাকা পাঠায়।

অর্পিতা অফিসের বস অনুপ রায়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অনুপ রায় ছিল বিবাহিত। তার স্ত্রী চন্দ্রা তাদের সম্পর্কের কথা আগে থেকেই জানতো। একদিন অনুপের স্ত্রীর ফোন পেয়ে হঠাৎই উচ্ছল হয়ে ওঠে অর্পিতা, নড়বড়ে হয়ে যায় তার সমস্ত ভাবনা। ফোনের ওপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে চন্দ্রার অসহায় কাতরতা—

> "ভিভোর্স চাইলে দেব।...কিন্তু, মেয়েমানুষ হিসেবে একটাই অধিকার ছিল আমার। কারুর স্ত্রী হয়ে থাকার অধিকার, সেটা তুমি কেড়ে নিচ্ছ কেন!"[১৪]

সিদ্ধার্থ একদিন বিশাখাকে আশ্বাস দিয়েছিল, তাদের সম্পর্ক কেবল পত্র বিনিময়ের মধ্যেই থেমে থাকে, তারপর একদিন সেই অভ্যাসেও ছেদ পড়ে। অর্পিতাও চন্দ্রার অধিকার ফিরিয়ে দেয়। অ্যাবরশন করিয়ে নেয় অর্পিতা। সঙ্গে থাকে বিশাখা। তখন বাঁচবার জন্য, বেঁচে থাকবার জন্য নিঃস্ব দুটি নারী পরস্পরের দিকে বাড়িয়ে দেয় বিশ্বাসের হাত। উপন্যাসের শেষে অর্পিতার বিষণ্ণ কিন্তু বলিষ্ঠ উচ্চারণ তাৎপর্য নিয়ে আসে, "দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো— "[১৫] দিব্যেন্দু পালিত এখানে অবৈধ বা অসামাজিক সম্পর্ক থেকে অর্পিতাকে সরিয়ে এনে এক ধরনের সুস্থ পরিবেশ রচনা করেছেন। এদিক থেকে চরিত্রচিত্রণে তিনি নিপুণশিল্পী।

জিনা :

'অবৈধ' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র জিনা। সে শিক্ষিতা এবং আধুনিকমনস্কা নারী। একুশ বছরে বি. এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন তাকে বিয়ে দেয়। ফলে মন কিংবা শরীর ঠিক কোন অনুভূতিতে কাতর ও সাড়া দেয় তা বোঝার আগেই সে স্বামীর প্রোপার্টি হয়ে যায়। জিনার মনে হতো অসীম তাকে ভোগ করতো। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা,

আবেগ, ভালোবাসাকে বঞ্চিত করতো। অফিসের পার্টিতে কিংবা অন্য কোথাও অসীম যখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্যদের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'দিস ইস মাই ওয়াইফ' তখন জিনার মনে হতো তার নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই।

স্বামীর বয়স বেশি হওয়ায় জিনার সঙ্গে মতের ছিল না। তার স্বামী ছিল কর্মময় মানুষ। কাজ নিয়েই পাগল থাকতো। অফিসের কাজে বেশিরভাগ সময়েই বাইরে থাকতো। ফলে ফ্ল্যাটে একা ও নিঃসঙ্গ জীবন কাটতো জিনার। জিনা সঙ্গ চাইতো। সেই সঙ্গ দিয়েছিল ফ্ল্যাটের যুবকপুরুষ পার্থ। জিনা পার্থকে খুব ভালোবেসেছিল। তাই আবেগের বশে জিনা পার্থর সঙ্গে পুরী ঘুরতে যায়। পার্থর সঙ্গে এক হোটেলে রাত কাটায়। কিন্তু পার্থ ছিল সুযোগসন্ধানী। সে জিনাকে পুরীর হোটেলে একা ফেলে পালিয়ে যায়। জিনা বুঝতে পারে না, সে কি করবে। যাকে সে ঘৃণা করতো সে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সমাজে পরিচয় দিয়েছিল আর যাকে সে ভালোবেসেছে সে কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে। আশ্রয় তো দূরের কথা ভালোবাসার বিশ্বাসটুকুও ধরে রাখতে পারেনি। এই দুই পুরুষের মাঝে জিনার মানসিক টানাপোড়েন লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

সারা :

'সোনালী জীবন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সারা। সে বাঙালি মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে হয় একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের ছেলে রবিনের সঙ্গে। সারা খড়্গপুরের মেয়ে। রেল কলোনিতে সে মানুষ হয়। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে কলেজে ঢোকবার আগেই তার বিয়ে হয়ে যায়। টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখেছিল সারা। দাম্পত্যজীবনের প্রথমদিকটা সুখেই কেটেছিল তার। কিন্তু স্বামীর চাকরি চলে গেলে প্রচণ্ড বিপাকে পড়তে হয় তাকে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারটি ছিল রক্ষণশীল। বাড়ির বাইরে মেয়েদের যাওয়া ছিল বিধিনিষিদ্ধ। সারার জীবনে ট্র্যাজেডি আসে ছেলে স্যামুয়েল যখন বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে রবিন থানায় গেলে সেও পুলিসের সঙ্গে বচসায় জেলে ঢোকে। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়া বাড়িতে আর দ্বিতীয় কেউ না থাকায় সারাকেই থানায় যেতে হয়। থানার বড়োবাবু সারার স্বামী আর ছেলেকে ছেড়ে দেয় সারাকে গোপনে তার ফ্ল্যাটে যাবার পরে। বড়োবাবুর হাতে সারা ধর্ষিত হয় এবং ক্রমে বাড়তে থাকে বড়োবাবুর অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা। পুরুষের উপভোগ্যের পণ্য হয়ে ওঠে সারা।

মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন নারী সারা কলঙ্কের ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। বড়োবাবুও জানতো, "মেয়ে মানুষ কলঙ্কে ভয় পায়, কলঙ্ক আড়াল করার জন্যেই কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ে আরও বেশি কলঙ্কে। তখনই ধরে নিয়েছিল, এই মেয়েটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়েমানুষকে নরমে গরমে না রাখলে ঝোঁকের মাথায় যে-কোনও দিন যা-তা করে ফেলতে পারে।"[১৬] সারার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। লেখক দিব্যেন্দু পালিত নারী চরিত্রের অসহায়তার চিত্র সারার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন।

ঋতুপর্ণা :

'সংঘাত' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ঋতুপর্ণা। লেখক ঋতুপর্ণাকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক বৃত্তির প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঋতুপর্ণা থিয়েটারে অভিনয় করে। আকস্মিকতা বদলে দিয়েছিল তার জীবনকে। বিয়ের দুমাস পর তার স্বামী মারা যায়। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে আশ্রয় হয় বাবার সেই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অনটনের সংসারে। ছোটোবোন, অসুস্থ বাবা আর অসহায় মায়ের জন্য সংসারের হাল তাকেই ধরতে হয়েছিল। শুরু হয় তার বেঁচে থাকার লড়াই। একটি স্কুলে পার্ট-টাইম চাকরি পায় সামান্য বেতনের। কিন্তু উপার্জনের বেশিটাই আসে থিয়েটার করে। অফিস-থিয়েটার থেকে একদিন সে স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছায়। আর গুণমুগ্ধ যুবক শান্তনুর সাহায্যে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয়ের সুযোগ পায়।

গ্রুপ থিয়েটারে 'সংঘাত' নাটকে সীতা চরিত্রের অভিনয়ের অভূতপূর্ব সাফল্য বদলে দেয় ঋতুপর্ণার জীবনকে। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়।

> "যতক্ষণ নাটকের পরিবেশে থাকে, ততক্ষণই নিজের অব্যবহিত বাস্তবের রূঢ়তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারে সে, ততক্ষণই মনে হয় সেই মুহূর্তে সেই মুহূর্তটিই সব, অন্যরকম সাবলীলতায় নিঃশ্বাস খেলা করছে পাঁজরের খাঁজে খাঁজে! মনে হয় অন্যের লেখা সংলাপ, অন্যের ভাবা চরিত্র, অন্যের দেখানো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও ভিতরের তাগিদে ওসবকে ছাপিয়ে নিজস্ব হয়ে উঠছে সে।"[১৭]

এভাবে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে নিজেকে আলাদা করে আবিষ্কার করে সে। বাইশ থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে সে নিজেরই মনের জোরে। নিজেকে

নিয়ে ভাবতে ভাবতেই খুঁজে পেয়েছে স্বনির্ভরতার অর্থ। সে আরো এগোতে চায়। তার আত্মবিশ্বাস অবচেতনায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জীবন বদলায় না, শুধু ক্বচিৎ রঙ পাল্টায়। অনেক আগে স্বপ্নে দেখা নিয়তি আহত করে ঋতুপর্ণাকে। ফিমারবোন ভেঙে সে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। মানসচক্ষে এক-একটা ইচ্ছার সমাধি দেখতে দেখতে আকস্মিকতায় কেঁপে ওঠে সে। নাটকের ডিরেক্টর অরিজিতের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সীতা চরিত্রে তাকে আর নেওয়া হবে না।

কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয় না। শান্তনু এসে জানায়, এবার তারা স্ট্রিট থিয়েটার করবে। উন্মুক্ত পথে চারদিকে মানুষকে রেখে হবে জীবনেরই নাটক। প্রেক্ষাগৃহের চার দেওয়ালে আভিজাত্যে আটকে পড়েছিল যে নাটক এবং নাটকের পরিচালক, এগিয়ে এসে যখন আর কিছু ভাবতে পারছিল না, তখন এইভাবেই আসে নতুন যুগ। দল ভাঙ্গে, দল গড়ে, আবার শুরু হয় মহড়া। আর ঋতুপর্ণা এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে খুঁজে নেয় শান্তনুর "কনুইয়ের ওপরের সেই জায়গাটা, অনেকদিন আগে একদিন মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের ভারসাম্য রাখতে যে জায়গাটা চেপে ধরেছিল সে।"[১৮] এইভাবে ভাগ্যের শাসন ভেঙে দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা বাঁচতে শিখেছে।

আত্রেয়ী :

'অনুভব' উপন্যাসের আত্রেয়ী চরিত্রচিত্রণে দিব্যেন্দু পালিত উপলব্ধির শীর্ষতায় পৌঁছান। আত্রেয়ীর নারী হয়ে ওঠার উপন্যাস এটি। সে পত্নীত্বে আবদ্ধ থাকতে চায়নি, একজন নারী হয়ে ওঠাই তার মূল লক্ষ্য ছিল। বাংলা সাহিত্যে এরকম চরিত্র খুবই কম।

'অনুভব' উপন্যাসের কাহিনি নারীদেহকে যুগে যুগে ব্যবহারের কাহিনি, যা অতীত কাল থেকে ঘটে আসছে। বর্তমানে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে, গ্লোবাল ট্যুরিজমের নামে যে 'সেক্স ট্যুরিজম্' প্রোমোট করা হচ্ছে, সেই বিষয়কে সামনে রেখে লেখক আত্রেয়ীকে এনেছেন। যৌনকর্মী বা কলগার্লদের নিয়ে আত্রেয়ী নমুনা সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষা করাটাই তার চাকরি। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্রেয়ী বুঝতে পারে, এর পিছনে আছে কোম্পানির নারীদেহকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার চক্রান্ত। সে উপলব্ধি করে নিজেও এই সব মেয়েদের মতো হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য মেয়েদের কেস হিস্ট্রিগুলি পড়ে নিজের মনের ভিতর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। হঠাৎকরে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেয়।

আত্রেয়ীর চরিত্র আমাদের ভাবিয়ে তোলে, চিন্তায় বিদ্ধ করে তোলে। যে মেয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য চাকরির জন্য কাঙাল ছিল, সে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল। বিবেকের তাড়নায় সে একটি নতুন যুগের সূচনা করে যায়।

আত্রেয়ীর সঙ্গে আরো দুই নারীর মানসিক দৃঢ়তার মিল রয়েছে— 'স্বপ্নের ভিতর'-এর বিশাখা এবং 'সংঘাত'-এর ঋতুপর্ণার। পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে বিশাখার মনে দানা বেঁধেছে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা। 'উইমেনস্ লিব্' পড়াশুনা করেছে সে। জীবনে সফল হয়েছে। 'সংঘাত'-এর ঋতুপর্ণার সংগ্রাম সমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল সে। তার সামনে কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। তবে প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতো মানসিক দৃঢ়তা ছিল। অকারণ ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়নি। বাঁচার জন্য লড়াই করেছিল, প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল।

নীলা :

'ওঠা কিংবা নামা' উপন্যাসের নায়িকা নীলা। একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করে। তার স্বামী অসীম। দুজনের চাকরিতে তারা নতুন ফ্ল্যাটে আসে। বিশেষকরে নীলার পদোন্নতিতে তা আরো সুবিধা হয়। নীলার অফিসের বসের সঙ্গে ভাব থাকায় নীলার আরো পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকে। নীলারই কথায়—

> "শ্যামলেন্দু তার ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এখন ওঠার মুখে, তরতর করে উঠছে শ্যামলেন্দু। সে এগোলে নীলাও এগোবে। তার মানে আরও টাকা, আরও সুখ, আরও স্বাচ্ছন্দ্য।"[১৯]

শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নীলার ভাবটা অসীম ঠিকভাবে নেয়নি। তাদের মেলামেশায় অসীম সন্দেহ করেছে। বিশেষকরে প্রতিদিন শ্যামলেন্দু নীলাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটায়। নীলাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে অসীম। সাবধান করে দেয়। নীলা অসীমকে বোঝায়, "সে উঠলে অসীমও উঠবে। আজ যা হচ্ছে কালও যে তা হবে তার মানে নেই কোনও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"[২০] এগোতে চাইলে চাকরিটাই তার আশ্রয়।

কিন্তু যতো দিন গেছে ততো শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নীলার মেলামেশা বাড়তে থাকে। শ্যামলেন্দুর ফ্ল্যাট পর্যন্ত নীলা এগোয়। তাদের মেলামেশাটা আর গোপন থাকেনি। অসীমের

সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। অসীম বলে, "চাকরি ছাড়লেও স্বভাব তোমাকে ছাড়বে না। ... দেরি হয়ে গেছে।"[২১] ধীরে ধীরে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কটা ভাঙতে থাকে।

নীলা এতোদিনে অসীমকে চিনেছে। সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই পায়নি অসীমের চোখে। নীলা দুই পুরুষের মাঝামাঝি থাকতে চায় না। আত্মহত্যা করে এর সমাধান খুঁজতে চায়। বোঝাতে চায় সে অসীমকেই ভালোবেসেছে। কিন্তু নীলা আত্মহত্যা করতে পারে না। মনের ভিতর এক অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করে সে। শূন্যতায় ছুঁয়ে যায় তার সমস্ত আকাশ। মনের ভিতর একটাই কথা ঘুরপাক খায়, অসীম বলেছিল, চাকরি নিয়ে বাঁচতে, তাকে নিয়ে নয়। নীলা কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারে না।

নীলা একবারে আধুনিক নারী। অসীমের শিকলবাঁধা হাত সে মেনে নিতে পারেনি। চাকরি করে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল। নিজের ছোটো ছোটো স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে চেয়েছিল। অসীমের একগুঁয়েমি স্বভাব আর সন্দেহ তাকে সেটা করতে দেয়নি। তাই নীলা একা বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মুক্তি খুঁজেছে নিজের মধ্যে।

১. খ. প্রধান পুরুষ চরিত্র :

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্ররা সুযোগ পেলেই সমাজের সব অনুশাসনকে গলাধঃকরণ করে নীতির বাইরে যেতে দ্বিধা করেনি। আবহমান সংস্কারেই সমর্পিত হয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে অনেকেই। অনেকে সুদিনের স্বপ্নে বিভোর থেকেছে। অনেকে ক্রমশ বদলে-যাওয়া এবং বদলাতে চাওয়া মানসিকতা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

কথক (নামহীন যুবক) :

'ভেবেছিলাম' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন নামহীন যুবক। তার বয়স তিরিশ বছর। উপন্যাসে বেকারত্ব, প্রেমহীন জীবন, সংশয়, সংকট এবং ব্যর্থতার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে চলেছে। তার এই জীবনকাহিনির সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবিও ধরা পড়ে।

যুবকটি একজন সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণির। একসময় সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি পাগল ছিল। কিন্তু বয়স তিরিশের কাছাকাছি এসে কর্মহীনতার কমপ্লেক্স তাকে ঘিরে ধরে। তার চোখে তখন সবকিছু অবিশ্বাসে পরিণত হয়। একটি সংবাদপত্র অফিসে চাকরি পায়, কিন্তু

বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে অফিসের ম্যানেজারসহ অন্যান্যদের প্রতি সে বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। অফিসে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হতে হয় তাকে। সে মনেপ্রাণে কাজ করলেও কারো প্রতি আস্থাভাজন হতে পারেনি। অফিসকর্মীরা সুব্যবহারের আড়ালে তাকে ব্যবহার করেছে। বেশি সৎ হওয়ায় তাকে গণপতির মতো অসৎ মানুষের কাছে ব্যঙ্গের পাত্রও হতে হয়। আবার সেনগুপ্তর মতো অফিসারের মন পাবার জন্য, তাকে তার সুনজরে আসার চেষ্টা করতে হয়েছে। বন্ধু বীরেনের প্রেমিকা শ্যামলীর প্রতারণার খবর শুনে কথক আরো বেশি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের প্রতি ভণ্ডামি, প্রতারণা, বিশ্বাস হারানো— এসব কিছু তার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্টে তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে, সন্তানসম্ভবা নার্স প্রীতিলতা সরকারকে কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তার মাসমাইনে নব্বই টাকা কেউ একজন প্রতিমাসে তুলে নিতে থাকে। বিধবা প্রীতিলতা যার খবরটুকুও জানে না। অনাহারে দিন কাটা প্রীতিলতার কথা খবরের কাগজে আনতে চাইলে হেল্‌থ্‌ অফিসারের কারসাজিতে কথককে ফেঁসে যেতে হয়। এই ঘটনার একমাস পরে কথককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ-ছয়ের দশকের বিপন্নতা এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। একজন চাকরিহীন যুবকের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনির সঙ্গে নিজেরও জীবন মিলিয়ে দেন লেখক দিব্যেন্দু পালিত।

দাশরথি মিত্র :

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দাশরথি মিত্র। খুবই সামান্য বেতনে কেরানীর চাকরি করেন। তার উপার্জনে সংসার চলে না। উপার্জনশীল বড়ো ছেলে কনক সংসারের যাবতীয় ভার বহন করতো। কনকের আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সহ যে টাকা ছিল সবটাই ছেলের চিকিৎসায় ব্যয় করেন। ফলে সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর বিবাহ উপযোগী দুই মেয়ে তার ঘাড় থেকে ঝুলছে 'প্যারালিটিক' হাতের মতো। তার চাকরিরও আর মাত্র দুই বছর বাকি। পুত্রের মৃত্যুতে সে নিস্তব্ধ, শূন্য ও বিষণ্ণতায় ক্ষতবিক্ষত হয়। লেখকের কথায়—

"দেখেই মনে হয় নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা মানুষটি— থলি হাতে বাজারে যান সকালে, অফিসের সময়ে অফিসে, ফেরার ভিড়ে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকেন দূরে, আর চিন্তায় ঘুম হয় না রাতে।"[২২]

জীবনে চলার পথের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির কেরানী দাশরথি মিত্রর ট্র্যাজিক যন্ত্রণার কথা লেখক উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। পুত্রশোক নিয়ে দাশরথি নির্বিকার এবং উদাসীন। সবসময় তার মেজাজ রুক্ষ। মুখের ভাষা ও আচরণে বেসামাল হয়ে পড়েন। ছেলের শ্রাদ্ধশান্তির জন্য ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা বেশি দিতে চাননি। বরং ব্রাহ্মণের গায়ে হাত দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের নামাবলি রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন। ক্ষিপ্ত মনে চিৎকার করে বলেছেন, "আটান্ন বছর বয়সে নিজের হাতে সন্তানকে পুড়িয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি। কাউকে ভয় পাই না। শ্রাদ্ধের মুখে লাথি মারি— "[২৩]

সাময়িকভাবে জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ে দাশরথি হেরে গেছেন। কয়েকটা টাকা বাঁচাবার জন্যই তিনি আজকের দিনে রাস্তায় নামলেন, মানসম্মান নষ্ট করলেন। তার যন্ত্রণাদগ্ধ বিকৃত আচরণ আরো ধরা পড়ে ছেলের ইনসিওরেন্সের টাকায় রেস্টুরেন্টে খেতে ঢোকার পর। কালাশৌচের সময়ও তিনি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে কাটলেট ও কফি খেয়েছেন। অনেকটা লোভী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন তিনি। আসলে জীবনের কাছে হার মানতে পারেননি দাশরথি। বিবেকবোধে ছেলের বন্ধুদের একদিন ইনসিওরেন্সের টাকায় খাওয়াতে চেয়েছিলেন।

মনে রাখতে হবে, যে সময়ে উপন্যাসটি রচিত তখন বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম টালমাটাল অবস্থা। আর্থিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ দিশাহীন। না খেতে পেরে মানুষ পথে বসেছে। এই অবস্থায় তবু ভাঙাচোরা রাজনীতিই ছিল নিরন্ন অসহায় মানুষের শেষ আশ্রয়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় পুত্রশোকের যন্ত্রণাকে সহ্য করে অবলীলায় দাশরথি মিছিলে যোগদান করেছেন—

"মিছিলের মধ্যে মিশে অন্যদের সঙ্গে আকাশে মুঠি তুলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন দাশরথি। এতো দিনে আরো শীর্ণ হয়েছেন, আরো ন্যুব্জ। কিন্তু এই মুহূর্তে অদৃশ্য কোনো শক্তি ওঁর মুখে তীব্র প্রত্যয় এনে দিয়েছে।"[২৪]

নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের রাজনীতিই ছিল প্রতিবাদের সুর। তারা সারাজীবন কিছু না পেলেও মিটিং-মিছিলে অনায়াসে যোগ দিয়েছে। মার খেয়েছে কিন্তু পিছিয়ে পড়েনি। দারিদ্র্যের সীমাহীনতায় ভেসে গেছে তাদের ঘর-সংসার, পরিবার। কিন্তু বাঁচতে ভোলেনি। স্বপ্ন দেখে গেছে যদি জীবনে কোনোদিন সুখ আসে। তাই উপন্যাসের শেষে দাশরথির মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরের দিকে ওঠানো এবং তাতে মিশ্রিত সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের সুর। লেখক এই চরিত্রটি সৃষ্টি করে আমাদের এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন হয়তো।

রামতনু সোম :

'সম্পর্ক' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রামতনু সোম। সে একটি বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিজ্ঞাপন জগতের একজন কৃতী পুরুষ বলে তার সুপরিচিতি। রামতনু সোম কাজপাগল মানুষ। কুড়ি বছরের চাকরি জীবনে সে একবারও ছুটি নেয়নি। কোম্পানির উন্নতির জন্য সে রুটিনমাফিক কাজ করে গেছে। অসম্ভব তার নিষ্ঠা। নিজের ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের ফলে অন্যান্য কোম্পানির অ্যাকাউন্ট সে ছিনিয়ে নিতে পারে। ছোটো ছোটো প্রতিযোগী এজেন্সিগুলি তাকে সম্মান করে, ভয়ও পায়। এরকম একজন মানুষ অফিসকর্মী অল্পবয়সী নীরার প্রতি পাগল। তাকে ঘিরে অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহে রামতনু পারিবারিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। নীরার সান্নিধ্য তাকে পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তারুণ্য ফিরে দিয়েছে। নীরার চুল, শরীরের গন্ধ তাকে বিবিধভাবে আকর্ষণ করে। অনেক সচেতন হয়েও সে নীরার মোহের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু নীরার প্রতি মোহগ্রস্ত, দুর্বল হলেও কখনই রামতনু তার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয়নি। নীরাকে কেন্দ্র করে পরিবারের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তাকে ভুল বুঝেছে কিন্তু নীরার প্রতি সে কোনো খারাপ ব্যবহারের সুযোগ নেয়নি। তার প্রতি সকলের অহেতুক সন্দেহ তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে সে। আবার পুত্রের কাছে স্ত্রীর অপমানের কথা শুনে নিজের মর্যাদাপূর্ণ আসন স্থানচ্যুত হওয়ার দুঃখে তার মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

এরপর রামতনু পারিবারিক জীবনে নিজের ভূমিকার বদল ঘটায়। এখন সে বেশিকরে পরিবারকে সময় দেয়। অসংখ্য কাজ থাকা সত্ত্বেও পুত্রবধূকে নিজে গাড়ি করে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে। সেখান থেকে ফিরে দীর্ঘদিন পর স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে মিলিত হয়। শারীরিক তৃপ্তি পেলেও মনের শান্তি পায়নি। কাজের চাপ আর

পরিবারের বন্ধন থেকে বেরতে পারেনি। ফলে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। ক্রমশ অন্ধকার ছেয়ে ফেলে তার মনকে। সবকিছু থেকে মুক্তি চেয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। নিঃসঙ্গ, একাকীত্বে কাটতে থাকে তার দিন। উপন্যাসের শেষে স্ত্রী-সন্তানহীন হয়ে রামতনু নীরার ফ্ল্যাটে আসে শেষ আশ্রয়ের জন্য, কিন্তু নীরাও তাকে আশ্রয় দেয়নি। সমস্ত সম্পর্কের বন্ধন ছিঁড়ে সে ক্রমশ একা হতে থাকে।

রামতনু চরিত্রের মধ্যে দুটি দিক ফুটে উঠেছে। একদিকে কাজপাগল এক কৃতী পুরুষ— যেখানে সে সৎ, কর্মপটু, শৃঙ্খলাপরায়ণ। আর অন্যদিকে পারিবারিক চাপে কিংবা অপমানে নীরার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত অসহায় এক বৃদ্ধের ছবি ফুটে ওঠে।

প্রিয়নাথ মজুমদার :

'আমরা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উপন্যাসের কথক প্রিয়নাথ মজুমদার। তার বয়স চৌত্রিশ। এম. এ পাশ করে একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করে সে। নিজের বসতবাড়ি কিংবা সম্পত্তি বলতে তার কোনোকিছুই নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন জগৎ ও জীবনের অনিবার্য গতিবেগে চরিত্রের বিবর্তন। সেই সঙ্গে লেখক নিজেকেও প্রিয়নাথের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' গ্রন্থে বলেন—

> "প্রিয়নাথ মজুমদারের স্বচ্ছ অস্তিত্বের মধ্যে ক্রমাগত খেলা করে চলেছে ব্যক্তি ও লেখক।...প্রিয়নাথ, আর যে তাকে সৃষ্টি করেছে সে, এক লোক নয় ; কিন্তু তার বুকে ও অনুভবে তার সৃষ্টি কর্তার হাতের ছাপ কি থাকবে না।"[২৫]

প্রিয়নাথ মজুমদার বস্তুসচেতন এবং আবেগহীন এক ব্যক্তি। নদীর জল, জাহাজের বাঁশি কিংবা সূর্যাস্তের লাল রঙের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা নেই। তবে অপমান তার খুব মনে থাকে। 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' আর 'রিপাবলিক' শব্দ দুটো তার লেখায় একবার জায়গা বদল করলে অফিসে তাকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়। অফিসের বস তাকে আলাদা করে ডেকে বলেন, 'কী রকম মানুষ মশাই আপনি!' ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির এমন ইম্পরট্যান্ট একটা দিন, তাও গুলিয়ে ফেললেন'। প্রিয়নাথ সেই অপমানের দিনটা মনে রেখেছিল চৌদ্দই অগাস্ট।

এই প্রিয়নাথের জ্বালা প্রচুর। সবকিছুতে গ্রহণীয় না হবার জ্বালা। সে সোজা রাস্তায় হাঁটে চলমান ভিড়ের গায়ে গায়ে ঘাম ও বেঁচে থাকার গন্ধ শুকতে শুকতে। প্রচণ্ড ক্ষোভে, রাগে চারপাশের গতানুগতিক বেঁচে থাকার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারে না। একসময় প্রিয়নাথ নিজেকে বলতো, 'নিশ্চিন্তে পেচ্ছাপ করার মতো একটা নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিস না!' অতীতহীন, ভবিষ্যৎহীন প্রিয়নাথ কোনো নির্দিষ্ট কাহিনির মধ্যে ঘোরাফেরা করে না। চলমান অথচ নিত্যক্ষয়িষ্ণু এক বর্তমানের উদাসীন অংশীদার সে। বিধানচন্দ্র রায় বলতে এখন সে বিধান সরণীই বোঝে। ক্ষণিকের ভালোবাসায় প্রেমিকা তনুশ্রীর জন্য বেশি রিস্ক নিতে পারে না। তাকে বিয়ে করবে, সে আশ্বাসও দিতে পারে না। এইভাবে নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রিয়নাথ আত্ম-উন্মোচন করে যায়। দেখিয়ে দেয় কীরকমভাবে বেঁচে আছি আমরা।

এই প্রিয়নাথ গল্প লেখে, কোনোটা ছাপা হয়, কোনোটা হয় না। ট্রাফিক পুলিস শম্ভু কিংবা বিধবা অমলাদিকে নিয়ে লেখা গল্প সম্পাদক কেন ফেরত দেয় তা বুঝতে পারে না। সুধা, তনুশ্রী, কৌশিক, মীনাকে নিয়েও একটা গল্প লিখে ফেলে 'আমরা'। এই গল্পে জীবন গতি পায়। চরিত্ররা নিজেদের জীবনে থেমে থাকে না। তারা 'বিষয়কে সিম্বলাইজ' করেছে। কিন্তু প্রিয়নাথ এ গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠেনি। কেননা তার চলা নিজের ভিতরের দিকে, কোথাও না কোথাও নিজের সঙ্গে।

এই উপন্যাসে রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত আছে। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাকে ভেঙে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ ধ্বনি দেয় 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ'। কিন্তু প্রিয়নাথের মনে এই রাজনৈতিক পালাবদল কোনো সাড়া ফেলেনি। সে তার অর্ধচেতন, অসাড় মন নিয়ে নিজের মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। আসলে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনীতির চাপে সবকিছুই তার মনে হয় আবেগহীন এবং গুরুত্বহীন। ভোগ ও ভোগহীনতার মধ্যে কোনো সদর্থক দিক সে খুঁজে পায় না। এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে লেখক একক মানুষের অস্তিত্বহীনতার কথা তুলে ধরেছেন।

দীপ্ত রায় :

এইরকমই আর একটি চরিত্র 'বিনিদ্র উপন্যাসের দীপ্ত রায়। সেও কাজপাগল মানুষ। হিন্দুস্থান ফস্টার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সে। বিজ্ঞাপন জগতে লড়াকু মানসিকতা

নিয়ে সে নিজের সাফল্য এনেছে। আরো সাফল্যের আশায় নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। সে একই সঙ্গে রামতনু সোমের সমগোত্রীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী।

নিরলস কাজের চাপে রামতনু সোমের মতো সেও পরিবারকে সময় দিতে পারেনি। সংসার তার কাছে নেহাত এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দায়িত্ব আর কাজের জন্য সে সমস্ত সম্পর্কে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। তাই অর্থ আর সচ্ছলতা দিয়েই সংসারের অবশিষ্ট দায়িত্ব তাকে পূরণ করতে হয়।

গভীর অধ্যবসায়, দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাসে বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতিষ্ঠিত কৃতী পুরুষ রামতনু সোমকে পিছনে ফেলে দিয়েছে দীপ্ত রায়। তার কাছে অভীষ্ট পূরণই মূল কথা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের স্ত্রীকেও সে অস্বস্তিতে ঠেলে দিয়েছে। অফিসকর্মী সুনীতাকে ব্যবহার করেছে অন্য কোম্পানির অ্যাকাউন্ট হস্তগত করতে। 'সম্পর্ক' উপন্যাসে রামতনু সোমও নীরাকে একইভাবে ব্যবহার করেছিল। তাদের কাছে নারী হয়ে উঠেছিল পণ্য। আবার অ্যাকাউন্ট হাতে চলে এলে সুনীতাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার পর দ্বিতীয়বার আর তার দিকে তাকাবার প্রয়োজনও মনে করেনি দীপ্ত। এইভাবে দীপ্ত রায় এক স্বার্থবাদী, সুবিধাবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে।

রামতনুর মতো দীপ্তর জীবনও পালটে গেছে। সময় আর পরিস্থিতি এক থাকেনি। তার জীবনেও একটা অপূর্ণতা ছিল। যা তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গতা আর শূন্যতার দিকে ঠেলে দিতে থাকে। বাইরে যতোটা শক্তিশালী, ভিতরে ততোটাই ক্ষয়ে যেতে থাকে সে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে রামতনু সোম স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-মেয়ে-জামাই— সকলের সফল সচ্ছল বৃত্তে থেকেও অল্প বয়সী নীরার আকর্ষণে নিজেকে জড়াতে থাকে। রাত্রে ঘুম না-আসা পর্যন্ত শূন্যতার অনুভবে ভয়ঙ্কর অসহায় লাগে তার। যেন দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই। ভরসা করার কোনো অবলম্বন নেই। নিজের গড়া সুখ-স্মৃতি-লাবণ্যময় সংসারে নিজেই আজ সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দীপ্ত রায়ও উপন্যাসের শেষে একা হয়ে পড়ে। বহুদিন পর মৃত পিতাকে স্বপ্নে দেখে চোখে জল আসে তার। মা-কে টাকা পাঠানোর ব্যাপারটা যাতে ভুলে না যায় সেজন্য স্লিপ বক্স থেকে কাগজ নিয়ে লিখে রাখে। ছেলে পাপুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় বলে ওঠে—

"বিহেভ ইওরসেলফ্! লোকে তোমাকে 'হার্টলেস্' বলে জানে— শরীর, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি আর লক্ষ্যের একাগ্রতায় হৃদয় বলে কিছুর প্রয়োজন তুমি বোধ করোনি কখনও। একরাতের দুঃস্বপ্ন আর স্মৃতির ভারে এতখানি বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যু স্বাভাবিক।"[২৬]

এইভাবেই সময়ের চাপে জীবন আর জীবনের অর্থ কতোখানি বদলে গেছে লেখক তা দীপ্ত চরিত্রের মধ্যদিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ব্রতীন :

'চরিত্র' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ব্রতীন। সে কলেজের অধ্যাপক। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় পুরুষের প্রবেশে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্ত্রীকে বেশি স্বাধীনতা দিতে গিয়ে ভুল করেছে। কলেজের অধ্যাপক বন্ধু নৃসিংহর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তার স্ত্রী আহামরি। ব্রতীন অনেকটা খামখেয়ালি, ভাবুকপ্রকৃতির। পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা করা সত্ত্বেও সে স্ত্রীকে কিছু বলতে পারে না। শুধু টের পায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙনের মুখে। উল্টো দিকে পাশ ফিরে শোয় তারা। এই দূরত্ব দুজনকেই ভাবিয়েছে। এক ধরনের অস্বস্তি আর মানবিক ক্লান্তিতে দিন কাটতে থাকে তাদের। "ইচ্ছে করে আজকাল অনেকটা সময় বাইরে কাটায় ব্রতীন।...মনে হয় ইতিমধ্যেই অনেকটা হেরে গেছে সে— সম্ভবত কোনো দিনিই ফিরে পাবে না পুরনো আবহ।"[২৭]

ব্রতীন বদলে যেতে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব ব্রতীন ভিতরে ভিতরে মেনে নিতে পারে না। তাই সে কলেজ ছাত্রী তৃণার সঙ্গে এক ধরনের জোর করে মিশতে থাকে। তৃণার সঙ্গে মেলামেশায় ব্রতীনের মনে লোভ সৃষ্টি হয় কিন্তু নিজের নীতিবোধ থেকে ব্রতীন সরে আসতে পারে না। নৃসিংহ যতোটা সহজে তার স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পেরেছে ব্রতীন ততোটা তৃণার সঙ্গে হতে পারেনি। আহামরিকে সে একসময় খুব ভালোবাসতো। তৃণার মধ্যে সে নিজের স্ত্রীর ছায়া দেখতে পায়। তাই কোথাও কোনো আশ্রয় পায়নি ব্রতীন। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন— "সম্ভবত একটু বদলে গেছে ব্রতীন। স্বভাব এমনিতেই তার চোখমুখ জুড়ে ছড়িয়ে রাখে ভাবুকতা; কথা যতো না বলে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে শুনতে। বন্ধু, সহকর্মী বাঁ ছাত্রদের সামনে হাসিই তাঁর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এ ক'দিনে একটু একটু করে বদলে গেছে সে। কলেজ আসে, ক্লাসে যায়— সবই প্রায় যন্ত্রচালিত; স্টাফরুমের বিভিন্ন

আলোচনা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনের প্রতি মনোযোগ বাড়িয়ে। একসময় চলে যায়।"[২৮]

শিশির রায় :

'একা' উপন্যাসের শিশির রায় এদেরই উত্তরাধিকারী। সে প্রচণ্ড আত্ম-অহংকারী। খ্যাতির দম্ভে তার পা মাটি স্পর্শ করে না। সে সুবিধাবাদী, স্বার্থবাদী। মদ আর যৌনতা তার বেড়ে ওঠার মূল আশ্রয়স্থল। একজন ভীরু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে সে। সে স্যান্ডহাম কোম্পানির তিন নম্বর পদমর্যাদার অধিকারী। তার কাছে নারী কোনো মর্যাদা বা সম্মান পায়নি। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মদের নেশায় অন্য নারীর প্রতি সহজেই আসক্ত হয়ে পড়েছে। নিজের স্ত্রী তার কাছে একটি 'প্রাণহীন বস্তুমাত্র'।

শিশির রায় আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র। সে শুধু নিজেকে নিয়েই ভেবেছে। স্ত্রীর চাহিদা বা ব্যক্তি গত ইচ্ছার কথা একবারও ভাবেনি। তাই তার স্ত্রী শ্রীলা ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। এতো প্রাচুর্য, এতো স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও হঠাৎই শ্রীলার মৃত্যুতে শিশির একা বোধ করে। নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে শিশিরের কাজের সময়, বেঁচে থাকার সময়। তার বিবেক হয়ে আসে গ্রামের বৃদ্ধ মাস্টার নীরদ ভট্টাচার্যের মতো। পুরনো ছাতা হাতে আটপৌরে পোশাকে যে দাঁড়িয়ে থাকে। শিশির ফিরে যায় দেশ-গাঁয়ের স্মৃতিমেদুর সহজসরল শৈশবে। এখানেই সে তার শেষ আশ্রয় খোঁজে।

'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'একা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে চরিত্রগুলোকে এক নিঃসীম একাকীত্বের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন লেখক। কিন্তু এরই কিছুটা সময় পরে লেখা 'ঢেউ' উপন্যাসে আগেকার অনেক সংশয়, সংকটের পথ পেরিয়ে একটা আশ্বাসের পথ দেখিয়েছেন। একটা স্থির বিশ্বাসে উপনীত থেকে চরিত্রগুলোকে বাঁচিয়েছেন। সমালোচক বলেছেন, "সম্পর্ক আর সম্পর্কহীনতার যে জটিলতা বিনিদ্র রেখেছিল রামতনুকে, দীপ্তর ঘুমের মধ্যে হানা দিয়েছিল হঠাৎ, একা করে দিয়েছিল শিশিরকে, সেই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল 'ঢেউ'-এ এসে।"[২৯]

রাজনৈতিক বাবার নীতিহীনতার বিরোধিতায় অপূর্ব বাড়ি ছাড়লেও সীতার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। 'আমরা' উপন্যাসের প্রিয়নাথের মতো সেও অপমান

সহ্য করতে পারেনি। অপমানবোধ অস্তিত্ব চিনিয়েছিল তাদেরকে। এরফলে তীব্র অভিমান নিয়ে কোম্পানিতে রেজিগ্‌নেশন লেটার দিয়েছিল। তারপর প্রায় উদ্দেশ্যহীন এক শূন্যতার অনুভূতি ঘিরে ধরে তাকে। সীতার প্রতি যে ক্রোধ, ঘৃণা, অভিমান তা অন্য এক বোধে সঞ্চারিত হয়। অন্যান্য চরিত্রের মতো এখানেও অপূর্ব আকাশের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। উপন্যসের শেষে হাসপাতালের সামনে ট্রলির উপর সাদা চাদরে ঢাকা সীতার বুকের মধ্যে নিজের ভাঙাচোরা মুখটা নামিয়ে নিয়ে এসে অপূর্বর কান্না হাহাকারে ভেঙে পড়ে— 'নো, ইউ কানট্ গো লাইক দিস'। 'সম্পর্ক' উপন্যাসে কম বয়সী মেয়ে নীরার সঙ্গে রামতনুর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি তার স্ত্রী, নীরাও শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছিল রামতনুকে। ফলে রামতনু একা হয়ে পড়ে। এই একাকীত্বের মধ্যে লেখক তাকে রেখে দিয়েছিলেন। 'বিনিদ্র' উপন্যাসেও দীপ্ত রায় স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে গেলে একা হয়ে পড়ে। 'একা' উপন্যাসের শিশির রায় নিঃসীম একাকীত্বে ভোগে। কিন্তু 'ঢেউ' উপন্যাসের শেষে অপূর্ব ভেসে যায়নি। সীতার নাবালক ছেলে বাবলুকেও অসীম মমতায় বিমলকৃষ্ণ আগলে রেখেছে।

অশোক :

'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অশোক। অশোক গ্রাম বাংলার ছেলে। চাকরির সূত্রে কলকাতায় থাকে। তিন কূলে তার কেউ ছিল না। গ্রাম বাংলাকে ভালোবাসার ছেলে অশোক কলকাতায় আসার সময় তার মনে হয়েছিল, জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে। একসময় অব্যক্ত অভিমানে তার আত্মহত্যার চিন্তা আসে। কিন্তু কলকাতায় এসে গঙ্গা নদী তীরবর্তী প্রকৃতি আর তার আশপাশের মানুষগুলোর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানকার নদী, ঘাস, মাটির সংস্পর্শের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়।

> "একা এসে দাঁড়ালে পৃথিবীর নির্জনতম জায়গা বলে চেনা যায়। জলের পর জলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সহজেই এলোমেলো করে দেয় ভাবনাগুলো।...শুধু বুঝতে পারে নদীটা তাকে টানে। নির্জনতা তার খুব প্রিয় নয়, নিঃসঙ্গতায় বরং একটু ভয়ই লাগে। তবু আসে, দাঁড়িয়ে দেখে।"[৩০]

নিজের গ্রাম থেকে এসে প্রথমে অশোক শ্যামশ্রীদের বাড়িতে সাত দিন কাটায়। এই কয়েকদিনেই তাদের বাড়ির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শ্যামশ্রীর মা রাজবালা দেবী তাকে

নিজের সন্তানের মতো দেখে। শ্যামশ্রীর দাদা বিষাণের সঙ্গে তার গলাগলি ভাব। একসঙ্গে নদীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যায়, ফুটবল খেলে, সিনেমা দেখতে যায়। এইভাবে তার দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু পরপর কয়েকটি ঘটনা তাকে এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের এতোটা বিপর্যস্ত, অসহায় করে দিয়েছে যার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই যেন নষ্ট হয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে, সময় ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে, কমে যাচ্ছে ভালোবাসার মানুষ। সে জানে এখানকার মানুষ তার কেউ নয়। স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে হয়তো কিছুটা যাওয়া যেতে পারে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুনতে পায় নিঝুম হয়ে যাচ্ছে শহরটা। একদিন সব থেমে যাবে। শুয়ে থাকতে থাকতে আদ্যন্ত বিষাদে মগ্ন হয়ে পড়ে। এই শহরের ভাঙাচোরা, বিবর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে থেকে এখন কোথায় সে নিজেকে খুঁজে পাবে তার চেষ্টা করে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে গ্রামবাংলার কথা নেই। সবই নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাই অশোকও স্বাভাবিক ভাবে নগর কলকাতার ব্যস্ত জীবনে এসে পড়েছে। শহর জীবনের অভিজ্ঞতা, কদর্যতা একজন গ্রামবাংলার ছেলেকে কেমন প্রভাবিত করে তাই লেখক তার মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রজত :

দিব্যেন্দু পালিত ছয়-সাতের দশকের অস্থিরতার আবর্তে নিরাপত্তা হারানো তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক মানুষের অসহায়তার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনীতি নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পুলিসি ব্যবস্থার সম্মিলিত ফাঁদের মধ্যে পড়ে যাওয়া ভিক্‌টিম্ যারা তাদের কথা তুলে ধরেছেন— 'উড়োচিঠি', 'সহযোদ্ধা', 'গৃহবন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে। সাতের দশকের রাজনীতি আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ছিল। 'উড়োচিঠি' উপন্যাসের চরিত্ররা তাদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এদেরই প্রতিনিধি রজত। সে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। মধ্যবিত্ত সমাজের ভীরু, দুর্বল, অসহায় বাঙালি চরিত্র থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজের সবরকম আবদ্ধতাকে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সে নির্ভীক। স্কুলের উঁচু ক্লাসে থাকার সময়ই একদিন তাকে বিনা কারণে পুলিস ধরে নিয়ে যায়। স্কুলের হেড মাস্টারসহ অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা কেউই এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। বরং হেডমাস্টার মশাইয়ের

উক্তি 'আমি প্রতিবাদ করার কে? পুলিসের অর্ডার!' নিরাপদে গাঁ বাঁচানো হেডমাস্টারের দুর্বল, ভীরু স্বভাব সমাজের নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়।

রজত পনেরো মাস জেল খাটে। জেলে অনেক মার খায়। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। জেল থেকে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এবার সে তার সাহসিকতার পরিচয় একাই দিয়েছে। ক্লাস চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের ইলেকশনের জন্য ভোট চাইতে আসা রাজনৈতিক কর্মীদের সরাসরি আক্রমণ করে। ভোট চাইতে আসা প্রার্থী ও তার সমর্থকদের সঙ্গে মারপিট করে। রজতের পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়নি। ক্ষমতার রাজনীতির অত্যাচারকে রজত মেনে নিতে পারেনি।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে বলা যায় রজতের নবজন্ম হয়েছিল। কান্নাকাটি কিংবা ভাগ্যের উপর কোনো দোষারোপ করেনি। তার বাবা-দাদা কেউ আর আশ্রয় দেয়নি তাকে। এমনকি তার দাদা মাসে মাসে যে টাকা পাঠাত পড়াশুনার জন্য, সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। রজতের পক্ষে পড়াশুনা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে নিজের লড়াই নিজে করে গেছে সে, কোনোরকম ভাগ্যের দোহাই দেয়নি। বরং ঘুণধরা পঙ্গু সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। তার অন্তরাত্মা বলে ওঠে, 'আমি শুধু চিনে রাখছি এই ঘা-গুলোকে, আর তোমাদের।...তোমরাই আমার জোর বাড়িয়ে দিচ্ছ'।

এই বয়সেই রজতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নীতিবোধসম্পন্ন একটি মানুষকে। যে সমাজের সমস্ত পঙ্কিলতাকে দূরে রাখতে চায়। সমাজকে গড়ে তুলতে চায় সুস্থ ও স্বাভাবিক। প্রেমিকা টুপুরের ভালোবাসা তার এই মনোভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয়। টুপুরের সমস্ত লজ্জা, সংকোচ মুছে দিয়ে সহানুভূতিতে তাকে কাছে টেনেছে। আলোর পথ দেখিয়েছে।

উপন্যাসের শেষে মধ্যবিত্ত আপসকামী মনোভাবাপন্ন তার বাবার কাছে রজত ঘৃণায় যায়নি। রজতের লড়াই ছিল সমগ্র সিস্টেমের বিরুদ্ধে। কিন্তু একার পক্ষে বদল ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই লেখক সচেতনভাবে 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আদিত্য রায়কে নিয়ে এলেন।

বিমান মজুমদার :

'অহঙ্কার' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিমান মজুমদার। সে মার্কেন্টাইল ফার্মের একজন ভালো কর্মী এবং সে বুদ্ধিমান। খুব সহজেই নিজেকে বিশ্লেষণ করে নিতে পারে এবং প্রয়োজন মতো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে তার অসুবিধা হয় না। সে ধীর, স্থির, সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হবার মতো মানুষ নয় সে। সে যুক্তিবাদী, কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষের মতোই সময়নিষ্ঠ এবং ছকে বাঁধা জীবনে অভ্যস্ত। সে অবিবাহিত। উপন্যাসে জ্যোতি আর নীপার দাম্পত্য সম্পর্কে সে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কুড়ি বছর ধরে জ্যোতি আর নীপার বাড়িতে ভাড়া থাকে বিমান। এই দীর্ঘ সময় ধরে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা গড়াকে লক্ষ করে সে। জ্যোতির রোগ, অসুস্থতা ও দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থতার আড়ালে নীপার প্রতি তার ভালোবাসা জন্মায়। কিন্তু পৌরুষের চেয়ে স্বামীত্বের জোর বেশি বলে সে ভয় পায়। আশ্রয় দিতে পারে না নীপাকে। কর্তব্য আর নীতিবোধের শিকলে বাঁধাকে সে এড়াতে পারেনি। শুধু বুঝতে পারে জ্যোতি-নীপার দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনে সেও ক্ষতবিক্ষত।

বিমান একজন কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে। সে সবসময় আত্মরক্ষা করে চলেছে। সুদেষ্ণা আর নীপার মধ্যে শুধু নিজের ভালোটুকু বজায় রাখতে চেয়েছে। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার জন্য নীপা বা সুদেষ্ণার কাছে নির্লিপ্ত থেকেছে। ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারেনি। উপন্যাসের শেষে জ্যোতি মারা গেলে মা ও মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেখায়নি সে।

আদিত্য রায় :

আদিত্য রায়ও একটি একক প্রতিবাদী চরিত্র। সে একটি বড়ো কোম্পানির এক্সিকিউটিভ এবং প্রতিবাদী লেখক হিসাবে তার খ্যাতি। 'স্বকাল', 'শঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত বের হয়। সে বলে, "লেখক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমি রাইফেল হাতে রাস্তায় নামব না; শ্রেণী সংগ্রামের জিগির তুলে সস্তা হাততালি পাবার দিকেও যাব না। আপনি তো জানেন, আমি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট কি নকশাল— কোনও রাজনৈতিক দলেরই সদস্য নই।"[৩১] একটি খুনের ঘটনার কোনো সাক্ষী নেই বলে আদিত্যকে একা লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। লড়াইয়ের চেহারাও পৃথক। সে এক নিঃশব্দ বিপ্লব। আদিত্য বুঝতে পারে সে একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যে সময় মানুষের মনের মধ্যে হারিয়ে গেছে

বিশ্বাস, প্রতিবাদ করার ন্যূনতম ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য সরকার তৎপর হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনে দেশ চলছিল। কোনো স্তরের মানুষেরই বাক্‌স্বাধীনতা ছিল না। সাংবাদিক এমনকি শিল্পীরও নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না। পুলিসি হামলায় বহু যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই— "গত চার-পাঁচ বছরে আমাদের বেস্ট বয়েজদের একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল! বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে এরা পড়াশুনা করে সহজেই চাকরি-বাকরি, প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে পারত। ভুল হোক ঠিক হোক, কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ! দেশ একদিন এদের মিস করবে। একদিন বুঝতে পারবে— "[৩২]

আবার লেখক সুবন্ধু মিত্র প্রশাসনকে আক্রমণ করে 'জহ্লাদের প্রশাসন' লেখার জন্য অ্যারেস্ট হয়েছে। বিদ্রোহী লেখা প্রকাশিত হওয়ায় 'স্বকাল' পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পাদক দেবু চৌধুরী সরকারি রোষে প্রকাশনা বন্ধ হওয়ায় চরম আতঙ্কের মুখে পড়েছে। এরকম অবস্থায় আদিত্য রায়ের সরকার বিরোধী লেখা প্রকাশ করতে সে দ্বিধাগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতেও আদিত্য মনে মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

তবে এরকম লড়াইয়ে সে ক্রমশ একা হতে থাকে। মনে একটা প্রবল ধাক্কা লাগে। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ে। সে প্রত্যক্ষ কোনো রাজনীতি করে না। সবসময় নিজের কাছে সৎ থাকতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সময় তাঁর লড়াইটা শুধু গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধেই নয়, নিজেরও বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বন্ধু ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অশোক দত্তকে জানালে সে আদিত্যকে সতর্ক করে দেয়। স্ত্রী শ্বেতাও তাকে সন্দেহ করেছে, প্রশ্ন করেছে— 'তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে'। স্ত্রীর কাছে আদিত্য খোলামেলা হতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছে এই লড়াইটা তার একার। তার এই ভাবনা চেঁচিয়ে বললেও কেউ বুঝতে পারবে না। আসলে তার অবস্থা হয়েছে—

'আলো-অন্ধকারে যাই— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;' ('বোধ'/জীবনানন্দ দাশ)

লোকাল থানার পুলিস গভীর রাতে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় আদিত্যর বাড়ি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও এই মুহূর্তে আদিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এক অলৌকিক শক্তি। সাধারণ মানুষ বিমূঢ় অবস্থায় যা করতে বাধ্য হয়। মেয়ে পৃথা ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরিস্থিতি বুঝে ভয় পেলে আদিত্য দৃঢ় কণ্ঠে জানায়, "মারা সহজ নয়। বুঝতে পারছিস না, ওরা ভয় না পেলে আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবত না।"[৩৩]

আদিত্য সাহসী, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সামাজিক বোধ এবং বিবেকধর্মী। উপন্যাসের শেষে তার মনন মৃত্যুঞ্জয়ী উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ। এমনকি তার স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনদর্শনও তাই। উপন্যাসের শেষে আদিত্যকে যখন পুলিস নিয়ে যেতে এসেছে তখন মেয়ে ভয় পেয়ে বলেছে 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে বাবা', তখন আদিত্যর কণ্ঠস্বর 'ওরা আমাকে মারতে পারবে না ওরা ভয় পেয়েছে'। এই সাহস, আত্মবিশ্বাস একজন সাহসী শিল্পীর। আর এই উপলব্ধিতে পৌঁছানোতেই দিব্যেন্দু পালিত আদিত্য চরিত্রের শুরু থেকে শেষ অবধি ক্রমবিবর্তন ঘটিয়েছেন।

আদিত্যর উৎস আমরা 'উড়োচিঠি' উপন্যাসের রজতশুভ্রর মধ্যে খুঁজে পাই। রজত স্কুলে পড়াকালীন বিনা কারণে পুলিসের ফাঁদে পড়ে। মিথ্যা খুনের অপবাদে পুলিশের মার খায় ও তিন বছর জেল খাটে। কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে ভেঙে পড়েনি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। টুপুরের ভালোবাসা তার কাছে জীবনাশ্রয় হয়ে উঠে। আদিত্য যেন সেই রজতেরই পরিণত বয়স্ক একজন মানুষ। সেদিন পুলিসের যে অত্যাচার রজত গায়ে সয়েছিল, সেই মিথ্যা খুনের অপবাদে ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন হয়তো একা সাহস পায়নি রজত লড়াই করতে। কিন্তু আদিত্য সাতচল্লিশ বছর বয়সে একা পুলিসের অমানবিক দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তাকে শেষে জেলে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু প্রশাসন ভয় পেয়েছিল বলেই মুষলধারা বৃষ্টিতে গভীর রাতে তাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিল। আদিত্যর বিশ্বাস ছিল—

"রাতের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার মধ্যে
শুধু ঐ প্রতিশ্রুতিই
হঠাৎ হঠাৎ জাগিয়ে দেয় আমাকে—
দেখো, ঠিকই ফিরে আসবো।" ('বড় ছেলে ছোট ছেলে'/দিব্যেন্দু পালিত)

দিব্যেন্দু পালিতের এরকম অসম্ভব সংবেদনশীল মন এবং কলম, যা আমাদের মধ্যবিত্ত রাজনীতি সচেতন অনুভূতিপ্রবণ মনগুলিকে মুচড়ে দেয়।

শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু পালিতেরও পুলিসের আচরণ আর মানবিক ন্যায়বোধের মধ্যে যে ফারাক তার প্রতি রয়েছে অসমর্থন এবং ঘৃণা। আসলে লেখক ভিতরে ভিতরে বহুদিন ধরে এরকম একটি চরিত্র হয়তো খুঁজেছেন কিন্তু রজতের মধ্যে তা পূর্ণতা পায়নি বা যুবক বয়সের যে রক্তের গরম তা দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করতে চাননি। তাই সচেতনভাবে আদিত্যকে নিয়ে এলেন।

সুশোভন মুখার্জী :

'অন্তর্ধান' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুশোভন মুখার্জীও একটি একক প্রতিবাদী চরিত্র। 'সন্ধিক্ষণ'-এর দাশরথি মিত্র কিংবা 'সহযোদ্ধা'র আদিত্য রায়ের মতো সুশোভন মুখার্জীরও লড়াই প্রশাসনের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে। রিটায়ার্ড অধ্যাপক সুশোভন মুখার্জীর বড়োদাদার মৃত্যুর দিনেই নিরুদ্দেশ হয় তার একমাত্র মেয়ে ইনা। অনুসন্ধান যতোই এগোতে থাকে পিতৃহৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের বিপ্রতীপে ততোই খুলে যেতে থাকে সমাজ ও প্রশাসনের নির্লজ্জ চেহারা। থানার ও-সি, ডি-আই-জি, কমিশনার, উকিলের কাছে অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়ান তিনি। এভাবে একসময় অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ সীমায় পৌঁছে যান। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু বিন্দুমাত্র আশা ছাড়েননি। মনের মধ্যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয় নিয়ে আসেন—

> "আমি ছাড়বো না— যতদিন না ওর অন্য কোনো খবর পাচ্ছি, ততদিন জানবো ও বেঁচে আছে। আমি খুঁজবো।"[৩৪]

মেয়ের জন্য শূন্য বুক পেতে চুপ করে থাকেননি সুশোভন মুখার্জী। নিজের আত্মবিশ্বাসে ভাঙন ধরলেও বিশ্বাসে চিড় ধরেনি তার। বিশ্বাসই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অদ্ভুত এক ব্যর্থতাবোধ সারাক্ষণ ছিঁড়ে খাচ্ছিল তাকে। এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারেননি। তাই স্ত্রীকে না জানিয়ে মেয়েকে খোঁজার উদ্দেশ্যে একা বেরিয়েছেন। জনৈক এক বিশ্বস্ত লোকের কাছে জানতে পারেন মেয়ের খোঁজ। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন।

"আমার নিজেরই দ্বিধা ও সন্দেহ আমাকে বঞ্চিত করল। এখন অনুশোচনা হচ্ছে এই ভেবে যে ঈশ্বর আমাকে সাহস দিয়েছেন, কিন্তু দেননি নিজেকে জয় করার সম্পূর্ণতা।"[৩৫]

নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভেবে ভয় পেয়েছেন। মেয়েকে ফিরে এনে যদি লোকে ঘৃণা করে। মেয়ে অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা ভেবে আশঙ্কা অনুভব করেছেন। তিনি স্ত্রীকে জানান—

"পুতুর জন্মদিনে, যেদিন তুমি রাতের ভয়ানক অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সেদিনই আমি অনুভব করেছিলাম আমরা আর স্বাভাবিক মানুষের মতো নেই; এই ক'মাসে হয়ে উঠেছি অন্ধকারেরই প্রাণী। আমাদের সম্মুখে কোনও দিশা নেই। এই সত্য স্বীকার মৃত্যুরই সমান।"[৩৬]

শেষপর্যন্ত মেয়ের খোঁজে গিয়ে সুশোভন মুখার্জীও হারিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তার গভীর যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়। লেখক তবু আশা ছাড়েন না। তাই জেদে, প্রত্যয়ে কঠিন হয়ে ওঠে নতুন তদন্তকারী অফিসার লোহিত রায়ের মুখ—

"সে জানে, যে কোনো সন্ধানেরই শেষে থাকে হয় জীবন, না হয় মৃত্যু। মাঝখানে কিছু নেই। যেভাবেই হোক দুটির একটিতে পৌঁছতে হবে তাকে।"[৩৭]

অনীশ দত্ত :

'অনুসরণ' উপন্যাসের মূল চরিত্র অনীশ দত্ত। সে পেশায় সাংবাদিক। বন্ধু পুলকেশের বাড়ি থেকে ডিনার সেরে আসার সময় মধ্যরাতে তার স্ত্রী এষা কিডন্যাপ হয়। পুলিসকে খবর দিলেও ঘটনাটি যাতে জানাজানি না হয় তার জন্য সে অনুরোধ করে। স্ত্রীর খোঁজ কেন সে আড়াল করতে চায়— এই প্রসঙ্গে তার চরিত্রে অসঙ্গতি দেখা যায়। পরবর্তীতে স্ত্রীকে খোঁজার কোনো উদ্বেগ সে প্রকাশ করেনি। বরং স্বাভাবিকভাবেই অফিসের কাজ করেছে সে। এষার থাকা কিংবা না থাকার মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটা তাকে স্পর্শ করে না। কিডন্যাপের সময়ই সে নিজেকে ছাড়া আর স্ত্রীর কথা ভাবেনি। আত্মরক্ষার জন্য সে জ্ঞান হারানোর ভান করেছিল। স্ত্রীকে বাঁচানোর কথাও ভাবেনি।

স্ত্রী অপহৃত হওয়ার পর অনীশের ভূমিকা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই দুর্ঘটনাটি কেন সে গোপন রাখতে চায় তা উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। কিন্তু এটা বোঝা যায়, স্ত্রীর না থাকাতে সে একরকমের স্বস্তি কিংবা মুক্তি পেয়েছিল। অপহৃত স্ত্রীর কথা না ভেবে বন্ধু প্রলয়ের স্ত্রী বর্ণার কাছে গেছে। উজ্জ্বল চেহারার যুবতী বর্ণার শরীরে ডুবে থাকতে চেয়েছে।

অনীশ স্বার্থবাদী এবং মিথ্যাবাদী। তার স্ত্রীর কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করলে সে সবাইকে মিথ্যা কথা বলেছে। কাজের মেয়ে সীমাকে আর তার বাবা-মাকে বলেছে এষা তার বাপের বাড়ি গেছে। এষার মাকে বলেছে এষা শান্তিনিকেতনে ঘুরতে গেছে। অফিসের সহকর্মী বন্ধু অশোককে বলেছে, এষা তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে গেছে। পুলিসের কাছেও মিথ্যা কথা বলেছে। পুলিস এষাকে খোঁজার জন্য তার সহযোগিতা চাইলে অনীশ সত্য কথার সঙ্গে কিছুটা মিথ্যাও বলেছিল। পুলিসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে বলে, মধ্য-কলকাতার একটি গলিতে একজন লেডি ডাক্তারের কথা। কিন্তু গলিটি দুটি মধ্য রাস্তার মধ্যে সংযোজক, ওখানে একটি বস্তি আছে আর কোনো দিনই সেখানে কোনো লেডি ডাক্তার ছিলেন না।

অনীশ এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। পত্রিকায় ধর্ষিত মায়ারানীর খবর পড়ে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে। ছাব্বিশ বছরের গৃহবধূ মায়ারানী অপহৃত ও ধর্ষিত হওয়ার পর তার স্বামী তাকে ঘরে ফিরে আনে। যদি এষাকে খুঁজে পায় পুলিস, সে কি পারবে তাকে আবার গ্রহণ করতে? পাড়াপ্রতিবেশী কি বলবে এ ব্যাপারে? কীভাবে তাদের দিকে তাকাবে? অনীশ মায়ারানীর ঘটনাটি মেনে নিতে পারেনি বলে নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল। মধ্যবিত্ত মানুষের সন্দেহপ্রবণতা অনীশের মধ্যে প্রবলভাবে লেখক তুলে ধরেছেন।

ধীমান :

মানুষের চরিত্রে যে গভীর রহস্য থাকে তা দিব্যেন্দু পালিত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন মানুষ একই সঙ্গে কীভাবে উদার এবং স্বার্থপর হতে পারে, একইসঙ্গে কীভাবে ভালোবাসা এবং ঘৃণায় জর্জরিত হতে পারে— এই বৈপরীত্যকে তিনি দেখান 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসের ধীমান চরিত্রের মধ্যদিয়ে।

ধীমান পেশায় সাংবাদিক। সে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবরকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে। চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে যে প্রৌঢ় দম্পতি আত্মহত্যা করে, সেই

খবরের ভেতরে কোন ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করেছিল ভেবে ধীমান বিপন্ন বোধ করে। আবার সেই খবরটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। অন্যদিকে একইদিনে টিভিস্টার নিশা দত্ত সুইসাইড করে, কিন্তু সেই খবর ধীমানদের খবরের কাগজ 'জনকণ্ঠ' মিস করেছে। অন্য কাগজটি দুটি খবরই দিয়েছে, কিন্তু টিভিস্টারের সুইমিং কস্ট্যুম পরা ছবির নিচে তার আত্মহত্যার খবরটিকেই প্রধান করে প্রৌঢ় দম্পতির আত্মহত্যার খবরটি গুরুত্বহীনভাবে ছেপেছে। এরফলে ধীমানের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। একজন সুন্দরী টেলিভিশন অভিনেত্রীর মৃত্যু সংবাদ কীভাবে প্রৌঢ় দম্পতির মৃত্যু সংবাদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা ভাবতে গিয়ে সামাজিকতায় ধীমানের মানসিকতা আঘাত খায়।

এই ধীমানেরই একটি বিপরীত মানসিকতা ধরা পড়ে যখন তার স্ত্রী সোহিনী অপহৃত হয়। মধ্যরাতে সোহিনী অপহৃত হলে ধীমানকে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের কাছে মিথ্যা বলে খবরটি চেপে রেখে সোহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। থানায় গোপনীয়ভাবে ডায়েরি করলেও সোহিনীর কোনো খবর পায় না। ধীমানের সঙ্গে তার বন্ধু পত্নী শীলার সম্পর্ক আছে। শরীরের সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই, তা পেরিয়ে আরো একটু গভীরে কোথায় হয়তো জড়িত। সোহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ধীমান তার প্রেমিকা শীলার সঙ্গে গোপনীয়ভাবে মিলিত হয় এবং শীলাকে হত্যা করতে করতে নিজেকে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে হয়। তীব্র অনুভূতিময়, ইন্দ্রিয়বোধে জারিত এই এরকম একটি চরিত্র অঙ্কনে লেখক নাগরিক মধ্যবিত্ত জটিলতার মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলেন।

২. উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র :

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যসের অপ্রধান চরিত্রগুলিও মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক। তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি উপন্যাসে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর চিত্র ফুটে ওঠে। যেমন 'সিন্ধু বারোয়াঁ' উপন্যাসে সৌম্য, জয়ন্তী, বিভাস এবং মলিনা। সৌম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। সে বরাবর ক্লাসের ফার্স্ট বয়। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় মলিনার সঙ্গে। সবাই ভাবে তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু সৌম্যর মনে মলিনার প্রতি কোনো ভালোবাসার অনুভব জন্মায়নি। দর্শন বিভাগের ছাত্রী জয়ন্তীর প্রেমকেও সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার কাছে পড়াশুনাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আসে অরুন্ধতী। জানতে পারে অরুন্ধতী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। অরুন্ধতীকে দেখে

তার মনের গভীরে ভালোবাসা জন্মায়। চেতনার গভীর স্তরে অরুন্ধতী প্রবল ঝর তোলে। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ এলে সৌম্য কেরিয়ারিস্ট হয়ে পড়ে। অরুন্ধতীর বিয়ে হয়ে গেলেও সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে না। বরং এর থেকে মুক্তি পেতে সে পুরীতে পালিয়ে যায়। উপন্যাসে কোথাও সৌম্যর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যে প্রেমকে একদিন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই জয়ন্তীর প্রেমে আশ্রয় খুঁজেছে। দিব্যেন্দু পালিত এক মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের চিত্র তুলে ধরেছেন সৌম্যর মধ্যদিয়ে।

বিভাস অরুন্ধতীর স্বামী। সাধারণ চাকরিজীবী। সে সহজ সরল। তার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর। সে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্যদিয়ে প্রকৃতির মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান খুঁজেছিল। সে বিয়ে করে সুখে জীবন কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু অরুন্ধতী তা দিতে পারেনি। ক্রমশ তার জীবন হয়ে ওঠে অশান্তির, কষ্টের। তবু সে দাম্পত্যজীবনের কলহকে চাপা রেখেছিল। নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে ঘুরতে যেতে দিয়েছিল। হয়তো স্ত্রীর মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল। কোনো সন্দেহ করেনি স্ত্রীকে। সবকিছু যখন নিঃশেষ হয়ে যায় সে নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছিল। উপন্যাসে কোথাও তার সঙ্গে কারো দ্বন্দ্ব বাঁধেনি। একমুখী এই চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সুনীল উপন্যাসের একমাত্র পরোক্ষ চরিত্র। সে বড়োলোকের ছেলে। একরোখা, জেদি, বখাটে। অরুন্ধতীর পিছনে লেগেছিল। কিন্তু না পেরে অরুন্ধতীর বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে হাত করে নিয়েছিল। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অরুন্ধতীকে দার্জিলিং নিয়ে যায় এবং সফল হয়। এরপর আর তার কথা উপন্যাসে নেই। হয়তো এরকম বহির্মুখী চরিত্র লেখক অঙ্কন করতে চাননি।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্ররা প্রেমের ক্ষেত্রে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে। 'সিন্ধু বারোয়াঁ'র সৌম্যই হোক আর 'সেদিন চৈত্রমাসে'র অমলেন্দু— কেউই তারা ঠিক মতো ভালোবাসতে পারেনি। ভালোবাসার মর্যাদা ও কর্তব্যকে সম্মান দিতে পারেনি। নারীরা সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসলেও তারা বিয়ের কথা শুনে পালিয়েছে। প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলে তারা বিন্দুমাত্র যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি। বরং স্বাভাবিকভাবেই মিশেছে। 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর নায়িকা এষার প্রেমিকা অমলেন্দু এরকমই একজন পুরুষ। বিয়ে হয়ে যাবার পরও এষা সমাজ-সংস্কার অপেক্ষা তার প্রেমে ধরা দিয়েছে। তার ভালোবাসাকে কাছে পেতে

সবকিছু ছেড়ে আশ্রয় চেয়েছিল অমলেন্দুর কাছে। কিন্তু অমলেন্দু বিয়ের কথা শুনে পালিয়ে গেছে। অসহায় এষার কথা একবারের জন্যও ভাবেনি।

এষার স্বামী মৃণালকান্তি। সে বিদেশে চাকরিরত। বিয়ে করে স্ত্রীর জেদের কারণে তাকে নিয়ে যেতে পারেনি। বাড়িতে তার বৃদ্ধা মা মরণাপন্ন হলে সে ফিরে আসে। এবং স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চায় তার কাছে। কিন্তু এষা মৃণালের সিঁদুরের অস্তিত্ব মুছে দিতে চায়। এষা ডিভোর্স চায় মৃণালের কাছে। একবছরের মধ্যে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে যেখানে মূল সমস্যা দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন, এই উপন্যাসে এষা আর মৃণালের মধ্যে দিয়ে তার সূত্রপাত ঘটে।

অঞ্জলি এই উপন্যাসের অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র। সে প্রচণ্ড সাহসী। স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় না পেয়ে ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নেয়। একটি সন্তান হয় স্বামী মারা যাওয়ার পর। সমাজের চোখে সে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু কাউকে পরোয়া না করে, পড়াশুনা করে স্কুলের চাকরি পায়। স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীন জীবন কাটায়। এষা স্বামী ও প্রেমিকের কাছে আশ্রয়হীন হলে তার কাছে আসে জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা নিতে।

'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসে নমিতার স্বামী মহীতোষ। উপন্যাসে তার কথা প্রত্যক্ষে নেই। কিন্তু তার সঙ্গে নমিতার বিবাহ বিচ্ছেদেই কাহিনির শুরু হয়েছে এবং কাহিনি এগিয়ে গেছে। ব্যবসার উন্নতির প্রয়োজনে সে নিজের স্ত্রীকে বন্ধুবান্ধব ও মক্কেলদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় মনোভাব তার পিছন ছাড়েনি। নারীর স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ায় স্ত্রীকে সে সন্দেহ করেছে, গালিগালাজ করেছে, লাথি মেরেছে। উপন্যাসের শেষে তার দ্বিতীয় বিয়ের প্রসঙ্গ আছে।

মহীতোষের ভাই পরিতোষ। স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ার পর পরিতোষই নমিতাকে সাহায্য করেছে। ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়া, আসবাব পত্র কিনে দেওয়া। মাঝে মাঝে তার ভালোমন্দ খবর নেওয়া। বলা যায়, পরিতোষই ছিল নমিতার একমাত্র অবলম্বন এবং সুখ-দুঃখের সঙ্গী। নমিতা পরিতোষ সম্পর্কে জানায়— 'বয়সে পরিতোষ প্রায় আমার সমান, হয়তো কিছু বড়ো। কিন্তু মানসিকতায় এখনও তেমন পোক্ত হয়নি'।

মনীশ মহীতোষের বন্ধু। উপন্যাসে তাকে ঘিরে যৌনতার প্রসঙ্গ বা অবৈধ সম্পর্কের প্রসঙ্গ এসেছে। মনীশ বিবাহিত। স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় সে নমিতার ফ্ল্যাটে গেছে। রাত্রি যাপন করেছে। নারী-পুরুষের যে বহুগামিতার প্রসঙ্গ দিব্যেন্দু পালিত তার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অঙ্কন করেছেন নমিতা আর মনীশের সম্পর্কে তার সূচনা ধরা পড়ে।

দিব্যেন্দু পালিত নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসে কিছু অপ্রধান চরিত্র অঙ্কন করেছেন। যেগুলি মূলত সময়কে চিহ্নিত করতে লেখক উপন্যাসে এনেছেন। 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের চন্দন কিংবা 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের পৃথা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। চন্দন নকশালপন্থী। তার অল্প বয়স। রক্তের প্রচণ্ড তেজ। একবার জেল খাটে। এখনো তার সাহস আর কনফিডেন্স প্রবল। সে বলে, 'আমি কি একটা কাওয়ার্ড! কী ভাবছে সবাই আমার সম্পর্কে, মারের চোটে আমি সব ভুলে গেছি! আমি এখন কনফিডেন্স খুঁজছি— আমি আবার অ্যারেস্ট হতে চাই— "[৩৮] অবশ্য তার এই রক্তের তেজ বেশিদিন থাকেনি। পুলিস-প্রশাসনের বিরুদ্ধে নকশালদের যে লড়াই, সে লড়াইয়ে পুলিসের গুলিবর্ষণের কোনো দোষ সে দেখেনি। তার কথায়— "দোষ আমাদের সমাজব্যবস্থার— সেখানে একটা ক্লাস— আর একটা ক্লাসকে ক্রমাগত শুষে যাচ্ছে। পুলিস সেই শোষণের মেশিনারি, বুর্জোয়া সিস্টেমের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র— "[৩৯] সময়ের কালপ্রবাহে চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পৃথা কিন্তু নকশাল আন্দোলনপন্থী নয়। পৃথা কলেজে পড়ে। নকশাল আন্দোলনে চতুর্দিকে পুলিসের ধরপাকড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। প্রতিদিন খবরের কাগজে পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারানোর খবর আর ছাত্রপুলিশের সংঘর্ষ দেখে পৃথার বাবা আদিত্য রায় মেয়ের কথা ভাবে—

> "দল ভেঙে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই নিখোঁজ। সকালে খবরের কাগজ এলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে খুন আর গ্রেপ্তারের খবরে। বুঝতে পারি, নাম খুঁজে। রাত্রে পুলিস ভ্যানের শব্দ শুনলেই শুকিয়ে ওঠে মুখ। কে বোঝাবে এই শব্দগুলো নতুন নয়— আগেও ছিল, পরেও থাকবে।"[৪০]

নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতায় দেশের যুবশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। উপন্যাসের শেষে পৃথার আবেগ, অনুভূতি, অভিমান প্রতিবাদ, ভয় সবকিছু একসঙ্গে ধরা পড়ে যখন তার বাবাকে মধ্যরাতে পুলিস অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে আসে— "তুমি যাবে না, বাবা। ওরা তোমাকেও

মেরে ফেলবে— ”[৪১] লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পৃথার মধ্যদিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখান।

‘সহযোদ্ধা’ উপন্যাসে আদিত্য রায়ের স্ত্রী মহাশ্বেতা। স্বামী-সন্তান নিয়ে তার সুখের সংসার। সহজসরল সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত সে। ফ্ল্যাটের অনেক ঘরেই তার যাতায়াত, অনেকের সঙ্গে তার সখ্যভাব। সে অনেকটা পেট আলগা। তাই আদিত্য খুনের ঘটনাটি স্ত্রীকে জানাতে পারেনি। গল্পের ছলে ঘটনাটি কাউকে বলে দিতে পারে। কিন্তু শেষে আদিত্য স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যায়। খুনের ঘটনার পরিণতি বুঝতে পেরে মহাশ্বেতা স্বামীকে বলে, “তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজে মরবে, আমাদেরও মারবে।”[৪২] মহাশ্বেতার মধ্যদিয়ে লেখক মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালি স্ত্রী চরিত্রের চমৎকার প্রকাশ দেখিয়েছেন লেখক। খুবই সাধারণ মানসিকতার এই চরিত্রটি সমকালের ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে স্বামী-সন্তানদের বাঁচাতে দূরে অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে লেখক মধ্যবিত্ত ভীরু মানসিকতার চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘সহযোদ্ধা উপন্যাসের ‘স্বকাল’ পত্রিকার সম্পাদক দেবু চৌধুরী এই রকম চরিত্র। সমকালীন রাজনৈতিক চাপকে সে খুব ভয় পেতো। আদিত্য রায়ের প্রতিবাদী গল্প ‘প্রতিবিম্বের অন্যদিক’ ছাপতে সে ভয় পেয়েছিল। সে আদিত্য রায়কে জানায়, “আমার মনে হল লেখাটার মধ্যে একটা পক্ষপাত এসে গেছে। অ্যাকুজেসন এসে গেছে। কোনও ভাবে মিসইন্টারপ্রিটেড হলে আপনাকে আমাকে নিয়ে টানাটানি হবে। ইন্‌স্টিগেটর ভাবতে পারে। সেন্টারে কংগ্রেস, এখানে প্রেসিডেন্টস্ রুল। পুলিস খেপে আছে। জানেন তো, এখন সমস্ত পলিটিক্যাল হাঙ্গামা ট্যাকল করছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট? ওদের চোখে সবাই ক্রিমিনাল!”[৪৩]

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে স্বার্থপর অপ্রধান চরিত্র অঙ্কন করেছেন। ‘সন্ধিক্ষণ’ উপন্যাসের অমিয়, নিখিল ও শ্যামল— এরা তিনজন কনকের বন্ধু। কনক মারা যাবার পর তিনজনের চরিত্রগত মুখোশ খসে পড়েছে। অমিয়র স্ত্রী রেখার সঙ্গে কনকের পূর্ব সম্পর্ক থাকায় রেখা হাসপাতালে একবারও কনককে দেখতে যায়নি। ভিতরে ভিতরে রেখা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভুগছিল— রেখার এই অনুভব অমিয় বুঝতে পারে। তাই সম্ভাব্য সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে তার মনে সন্দেহ জেগেছে। এই রকম পরিস্থিতি থেকে সে মুক্তি খুঁজেছে। এই মুহূর্তে এমন কাউকেই তার মনে পড়েনি, নিজের দৈন্য নিয়ে যার ওপর সে নির্ভর করবে। অমিয়

নিরন্তর অবসেসনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আত্মহত্যার চিন্তা তাকে করতে হয়।

নিখিল অনেকটা সুবিধাবাদী, স্বার্থপর। সে দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক। বন্ধুর বোন বুলা চাকরির জন্য তার শরণাপন্ন হলে সে অস্বস্তিবোধ করেছে। দিনের পর দিন তাকে ঘুরিয়েছে। রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে গিয়েও তার মনের মধ্যে দোলাচলতা দেখা দিয়েছে। বুলা বুঝতে পারে নিখিল তাকে সাহায্য করবে না। তাই তার করুণার পাত্র আর সে হতে চায় নি।

শ্যামলও স্বার্থপর। শুধু স্বার্থপর নয়, কাপুরুষও। কনকের ছোটো বোন ঝুমিকে সে ভালোবাসে। কনকের মৃত্যুর পর তাদের ভালোবাসা আরো গভীর হয়। নিত্য দারিদ্র্যের দিনে ঝুমি স্বপ্ন দেখেছিল শ্যামলের সঙ্গে ঘর বাঁধবে। তার উপর নির্ভর করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু শ্যামল তার ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি। শ্যামল লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে ঝুমিকে সিনেমা দেখিয়েছে, হোটেলে নিয়ে গেছে, তার ভাড়াবাড়িতে নিয়ে গেছে। অবশেষে ঝুমির কৌমার্যকে নষ্ট করেছে। ঝুমি বিয়ের কথা বললে শ্যামল পালিয়ে গেছে।

কনকের মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে চেয়েছিল বুলা। বুলা সমকালীন সময়ের বেকারত্বের শিকার। দাদার অফিসে চাকরির জন্য গিয়েছে। ম্যানেজারকে তোষামোদ করতে পারেনি বলে চাকরি হয়নি। দাদার বন্ধু নিখিলকে চাকরির খোঁজ দিতে বললে সেও সাহায্য করেনি। সে অসহায়, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। লেখকের কথায়—

> "নিজের ভাবনার মধ্যে ক্রমশ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বুলা। সে কি খুব স্বার্থপর হয়ে পড়েছে! না হলে আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশ এতো নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে কেন! দাশরথি, বসুধা, ঝুমি— সকলকেই ক্রমশ অন্য মনে হচ্ছে কেন! কেন ওদের শোক-সুখ-দুখ-সমস্যায় কাতর চাপা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনো জ্বালা, কোনো সহানুভূতি পায় না সে!"[৪৪]

দিব্যেন্দু পালিতের কিছু কিছু অপ্রধান চরিত্রে নীতিবোধ প্রধান হয়ে উঠেছে। 'আমরা' উপন্যাসে নয়নাংশুর স্ত্রী এবং তনুশ্রীর বৌদি সুধার মধ্যে এই নীতিবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। তারা একসময় অনায়াসে এগিয়ে যায় প্রিয়নাথের দিকে, তারপর প্রশ্ন করে 'এটা পাপ নয় তো?' তাদের এই নীতিবোধ মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে ধাক্কা মারে। 'চরিত্র' উপন্যাসে ব্রতীনের

স্ত্রী আহামরির মধ্যদিয়ে এই নীতিবোধের অনুষঙ্গ এসেছে। ব্রতীনের অধ্যাপক বন্ধু নৃসিংহের সঙ্গে আকস্মিক আবেগতাড়িত এবং প্রস্তুতিহীন সম্পর্কের পর আহামরি প্রবল কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে। নৃসিংহ আশ্বাস দেয় 'কেউ জানতে পারবে না'। কিন্তু আহামরির আহামরির জবাবদিহি তাঁর নিজের কাছে— "আমি তো জানলাম!"[৪৫]

'অহঙ্কার' উপন্যাসের জ্যোতি একজন সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি। কুড়ি বছরের দাম্পত্য সম্পর্ককে সে নিমেষেই ভেঙে দিতে চেয়েছে। অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে। প্রশ্ন তুলেছে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে। 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের অমিয়ও রেখার সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। স্ত্রীর আগত সন্তানকে নিজের বলে স্বীকার করতে পারেনি জ্যোতি। ফলে বেসরকারি হাসপাতালে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে আনে।

'অহঙ্কার' উপন্যাসে নীপা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ একজন নারী। স্বামীর হাতে মার খাবার পরও স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। স্বামীর দেওয়া সিঁদুরকে মুছে ফেলতে পারেনি। পরপুরুষকে ভালোবাসলেও তার সঙ্গে যেতে পারেনি। তার মধ্যে অভিমান আর অহঙ্কারবোধ দেখা দিয়েছে। প্রায় কুড়ি বছর ধরে স্বামী আর প্রেমিক পুরুষের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে ব্যবসায় মেতে উঠেছিল। সেই শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে পারেনি। দারিদ্র্যের কারণে অসহায়, দুর্বল হয়ে পড়েছিল তারা। নিত্যদিনের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি পুঁজিবাদী শক্তির কাছে ব্যক্তিজীবনের গুরুত্ব হারিয়েছিল। 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের রবিন সাধু খাঁ ও শীলা এই পুঁজিবাদী শক্তির প্রতিভূ। সাধু খাঁর স্টুডিয়োর ব্যবসা। খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক সে। নতুন নতুন মেয়েদের ছবি তুলে সে বিজ্ঞাপন জগতে মোটা অঙ্কের টাকা ইনকাম করে। মেয়েদের ফেস দেখে বুঝতে পারে কার কদর বেশি। ছবি তোলার ব্যাপারে জিনিয়াস সে। হিমাদ্রি ও জয়া তার কাছে যায় ছবি তুলতে। জয়া নিম্নবিত্ত সাধারণ ঘরের স্ত্রী। অসাধু ব্যবসায়ী রবিন সাধু খাঁ গোপনে হিমাদ্রি আর জয়ার সই করিয়ে নেয় ন্যুড অ্যালবামের ছবি তোলার জন্য। হিমাদ্রির অনুপস্থিতিতে জয়াকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে সাধু খাঁ।

শীলাও খুবই চালাক মেয়ে। ব্যবসার প্রয়োজনে সে জয়াকে প্ররোচনা দিয়েছে। ন্যুড অ্যালবামের ছবি দেখিয়ে জয়ার মন ভোলাতে চেয়েছে। টাকার লোভ দেখিয়েছে। জয়া এতে রাজি না হলে শীলা ধৈর্য হারায়নি, বরং নরম হয়ে বলেছে—

> "আপনাকে নেকেড হতে বলছি না। ব্রা পরবেন না, ব্রেস্টের খানিকটা সাজেশান পেলেই চলবে। তা ছাড়া— ; এটা তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ব্যবহার করা হবে না। কেউ জানতেও পারবে না। বিসাইড্স, আমরা আপনার বিউটিটাকেই তুলে ধরব।"[৪৬]

তারপর জয়ার নেকেড ছবি বের হয়। সাধু খাঁ আর শীলার বিভিন্ন ক্লায়েন্ট জয়ার সঙ্গে কথা বলতে চায়। দরদাম ঠিক করতে চায়। জয়া আর হিমাদ্রির দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত জয়াকে আত্মহত্যা করতে হয়। পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষকে কতোটা অসহায় করে তুলেছিল তা লেখক এই দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত 'সোনালী জীবন' উপন্যাসে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের নিপুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারটির বাসস্থান কলকাতায়। পরিবারটির কর্তা আর্থার পাইবাস। তার বয়স আশি বছর। তার স্ত্রী ডরোথি। তিন মেয়ে— রোজালিন, অড্রি, লরা এবং একমাত্র পুত্র রবিন। পুত্রবধূ সারা, সারা আর রবিনের পুত্র স্যামুয়েল। সারা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সে বাঙালি মেয়ে। লেখক চরিত্রগুলিকে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করেছেন। আর্থার পাইবাস পেশাগতভাবে সৈনিক ছিল। বার্মা মুলুকে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে এখন সে অবসর জীবন যাপন করছে। তার পেনসনের টাকায় গোটা পরিবারটি চলে। আর্থারের স্ত্রী ডরোথি পরিবারের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তাদের বাড়িতে পুলিসের লোক এসে রবিনকে খুঁজলে সারা বাইরে বের হয়। ডরোথি ছিল রক্ষণশীল। পুরুষ মানুষের সামনে বাড়ির মেয়ে বের হবে এটা সে মেনে নিতে পারেনি। তাই ডরোথি সারাকে বলেছিল, 'ওরা রবিনকে খুঁজতে এসেছিল। তোমাকে নয়!' রবিন হাওড়ার জুটমিলে কাজ করে। কিন্তু ইউনিয়নের লোকজনের সঙ্গে বচসা হওয়ায় তার চাকর চলে যায়। একমাত্র উপার্জনশীল ছেলের চাকরি চলে গেলে পরিবারের মধ্যে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। রবিন ছিল গোঁয়ার, রগচটা, খ্যাপাটে। জেল থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দেখতে না পেলে সে খেপে ওঠে। সারা ফিরলে বোধবুদ্ধিহীন, উত্তেজিত রবিন তাকে প্রহার করে। এছাড়াও আছে আর্থারের বড়ো মেয়ে

রোজালিন ও তার স্বামী মাইকেল এবং তাদের ছেলেমেয়ে ডোনাল্ড আর ডেইজি। আর্থার পাইবাসের মেজ মেয়ে অদ্রির বিয়ে হয় কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার স্বামী অলোক দত্ত। বিয়ের পর সে তার নাম পরিবর্তন করে রাখে অর্পিতা। লেখক অদ্রির মধ্যদিয়ে দেখান বাঙালি সংস্কৃতিকে। একদা যে মেয়ে জিন্স আর স্কার্ট পরতো, এখন সে শাড়ি, ব্লাউজ এবং সিঁথিতে সিঁদুর দেয়।

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে ওয়ার্কিং গার্লদের ছবি তুলে ধরেছেন। 'মধ্যরাত' এবং 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে প্রধান চরিত্রদের পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্কিং গার্লদের জীবন চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অপ্রধান চরিত্ররা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বাধীন। 'মধ্যরাত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তপতীর পাশাপাশি মেসবাড়ির বিভিন্ন মেয়েরা সাবিত্রী, বিনা, বাসন্তী, রত্না অঞ্জলি নীলা— এরা প্রত্যেকেই সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরি করে। সাবিত্রীর পেশা নার্সিং, সে মেসবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের একটু আলাদা স্বভাবের। সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না, তার আচরণ বা গতিবিধি কেউ ধরতে পারেনি। এক প্রকারের মানসিক রোগে ভুগতে থাকে সে। বিনা কুটির শিল্পের দোকানে কাজ করে। মেসের সবার থেকে বয়সে বড়ো বাসন্তী। সে বিধবা। বিয়ের তিন বছর পরে তার একটি ছেলে হয়। ছেলেকে বাপের বাড়িতে রেখে সে মেসে এসে থাকে। অতীতস্মৃতি সবসময় তাকে ঘিরে ধরে। তার এই কাহিনি মেসের অন্যান্য মেয়েদের সে প্রায়ই শোনাত। অভিভাবকহীন রত্নার জীবনে দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। সে তার বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। তার প্রাক্তন প্রেমিক বিশ্বনাথ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা তার কাছে ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। মেসবাড়ির সবথেকে বিদ্রোহী চরিত্র রিণা। মুখ বুঝে সে কোনো কথা সহ্য করতে পারে না। সে হাসিতে খুশিতে উচ্ছল স্বভাবের মেয়ে। ভদ্রতা আর আন্তরিকতায় সহজসরল মেয়ের চরিত্র নীলা। অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে। এই সব মেয়েদের থেকে লেখক সবচেয়ে বেশি জীবন্তরূপে অঙ্কন করেছেন অঞ্জলি চরিত্রটিকে। অঞ্জলি কম বয়সি মেয়ে। চাপা স্বভাবের, প্রেম করত লুকিয়ে। আবেগের বশে প্রেমিক সুনন্দর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অঞ্জলি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে বিয়ে করার ভয়ে সুনন্দ পালিয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে গর্ভপাত করাতে গিয়ে অঞ্জলির মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে অন্যান্য চরিত্ররা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসেও লেখক মেসবাড়ির ওয়ার্কিং মেয়েদের ছবি তুলে ধরেছেন। 'মধ্যরাত' উপন্যাসের থেকে এই উপন্যাসের মেয়েরা অনেক বেশি পরিণত ও মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। আসলে লেখক এই সময় পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ। পরিণত বয়সের মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিব্যেন্দু পালিত এই উপন্যাসে মেয়েদের চরিত্রের বিভিন্ন ডাইমেনসনকে তুলে ধরেছেন। মেয়েরা স্বনির্ভর এবং স্বাধীন হলেও আর্থিক বিনিশ্চয়তা তাদের মানসিক তৃপ্তির পরিপূরক হতে পারেনি, তাই তারা খুঁজেছে নিজস্ব সঙ্গ, নিজস্ব কোনো আশ্রয়। প্রাবন্ধিক শ্রাবণী পাল এই সব মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন—

> "প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে মেলে না প্রায়শ, এ কথা প্রাপ্ত বয়স্ক পরিণতমনস্ক তাদের অজানা নয়, তবু বোধহয় স্বপ্নেরই ভিতর চলতে থাকে তাদের আশা-হতাশা, বেদনা-বঞ্চনার এক শব্দহীন এবং সম্ভবত, অন্তহীন খেলা— স্মৃতি ফিরে আসে স্বপ্নে, সাহচর্য ভুলিয়ে শঙ্কা, নারীত্বের অহঙ্কার কখনোবা জায়গা ছেড়ে দেয় নারীত্বের অসহায়তাকে।"[৪৭]

'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিশাখা ও অর্পিতা ছাড়া অপ্রধান চরিত্রগুলি হলো— ছন্দা, নিবেদিতা, সুলেখা, মমতাদি, শুক্লা, রমা প্রভৃতি। এরা সবাই ওয়ার্কিং উইমেনস্ রেসিডেনসিয়ায়ল হোমে বাস করে। সবাই চাকরিজীবী। ছন্দা মার্কেট রিসার্চ অর্গানাইজেশনের হয়ে ডোর-টু-ডোর স্যাম্পল সার্ভে কাজ করে। জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকতে পরবর্তীতে সে যৌনতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। নিবেদিতা ডিভোর্সি, স্টুয়ার্ট মর্গান অফিসের রিসেপশনিস্টের কাজ করে। শুক্লা দেমাকি, ধৈর্য কম, অল্পতেই রেগে ওঠে। রত্না ফুড কর্পোরেশনের কাজ করতো। সুবর্ণা স্কুলে চাকরি করে। বয়স কম, কিন্তু মিশুকে। বিশাখা তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে— "বর্ধমানের মেয়ে, বি-এ পাশ করার পর বাবা মারা যায়, বাধ্য হয়েই নিয়েছে চাকরিটা। এর মধ্যে বি-টি পাশ করেছে। এখান থেকে টাকা পাঠায় মা-কে।"[৪৮] মমতাদি বয়স্কা ও বিবাহিতা, চুপচাপ মানুষ। চাকরি করে কর্পোরেশনে। রমার বয়স চল্লিশ, কালো, পেটানো স্বাস্থ্য, আঁটোসাঁটো চেহারা। হাবড়ায় হেলথ ভিজিটরের চাকরি করে। বয়সে প্রৌঢ় সুলেখাও ভদ্ররুচির। সে নার্সের কাজ করে। উপন্যাসের শেষে তার নামে মিথ্যা রটনা ওঠে, সে নাকি মেয়েদের বেশ্যাপল্লীতে নিয়ে যাওয়ার করে। সুলেখা বলে, "পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। আঠারোয় বিধবা হয়েছি, তারপর কাজ শিখে নার্স হলাম। এই সাত্তাশ আঠ্ঠাস বছরে কত প্রলোভন! কোনও পুরুষকে ঘেষতে দিই নাই কাছে। আমার তো

জীবন নাই! আছে ক? শরীরটা আছে। সেটা খেতে চায়, এই কাজ না করলে খাব কী! আমি তো লেখা পোড়া শিখি নাই!”[৪৯] ভয়ঙ্কর অপমানে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল সুলেখা।

অপ্রধান চরিত্রচিত্রণে বিশিষ্টতা দেখা যায় ‘ভোরের আড়াল’ উপন্যাসে। উপন্যাসটি বস্তিজীবনকেন্দ্রিক। দিব্যেন্দু পালিত এখানে মধ্যবিত্ত চরিত্রচিত্রণের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমা থেকে সরে এসেছেন। এই উপন্যাসে বস্তিজীবনের গায়ে গায়ে লেগে থাকা জলধর, সরস্বতী, মৌসুমি, সন্ধ্যা, মৃদুলা, গীতা, শ্রীধর, গোপাল প্রমুখদের নিত্য-দিনের অভাব-অনটনের চিত্র ফুটে উঠেছে। মৃদুলার স্বামী সুদর্শন ট্রাক ড্রাইভার। দিল্লী, বোম্বাই, পাটনা, রাঁচি প্রভৃতি এলাকায় মাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে সে পাড়ি দেয়। হঠাৎ একদিন সে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর সংসারের অভাব-অনটন মেটাতে তাঁর তিন মেয়ে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। বড়ো মেয়ে সন্ধ্যা দেহোপজীবী হয়ে পড়ে, ফ্ল্যাটবাড়ির বাবুদের সেবায় তাকে দিনরাত নার্সবৃত্তি করতে হয়। অপর দুই মেয়ে মালতী ও করবী বাড়িতে বসে ঠোঙা বানায়, রাস্তার ধারের মুদির দোকানে বিক্রি করে। আর মৃদুলা রেল লাইনের ধারের ঘাটাল থেকে ঝুড়ি ভর্তি গোবর এনে সরকারি দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়।

সুতরাং দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্রচিত্রণে পরিশীলিত ব্যবহার পাঠককে মুগ্ধ করে। চরিত্রকে একেবারে ভিতর থেকে তিনি উপলব্ধি করে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। নিখুঁত বর্ণনার মধ্যদিয়ে পাঠককে সন্ধান দেন সেই সমস্ত বিচিত্র চরিত্রের, যার অতলতলে স্তরে স্তরে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য রত্ন। চরিত্রের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যের অভিনব স্বাদ কখনোই অতিরঞ্জিত দোষে দুষ্ট হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৩২

২. তদেব : পৃ. ১৫৬

৩. তদেব : পৃ. ১৭০

৪. তদেব : পৃ. ১৭৫

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, বসু চৌধুরী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃ. ৬২

৬. পালিত, দিব্যেন্দু : মধ্যরাত, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৭৫

৭. তদেব : পৃ. ৩৫৬

৮. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৬০

৯. তদেব : পৃ. ৩৭৯

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৫০

১১. পালিত, দিব্যেন্দু : স্বপ্নের ভিতর, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৩৭৭

১২. তদেব : পৃ. ৩৮১

১৩. তদেব : পৃ. ৩৮২

১৪. তদেব : পৃ. ৪৪৫

১৫. তদেব : পৃ. ৪৪৬

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : সোনালী জীবন, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৩১

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সংঘাত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৭৪

১৮. তদেব, : পৃ. ১২৬

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : ওঠা কিংবা নামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১০৬

২০. তদেব : পৃ. ১২৪

২১. তদেব : পৃ. ১৪৩

২২. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৫

২৩. তদেব : পৃ. ৪১

২৪. তদেব : পৃ. ৬৩

২৫. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছুস্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৪

২৬. পালিত, দিব্যেন্দু : বিনিদ্র, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩০২

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : চরিত্র, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৪৭

২৮. তদেব : পৃ. ৩৪৭

২৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৫

৩০. পালিত, দিব্যেন্দু : বৃষ্টির পরে, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮৭

৩১. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫১

৩২. তদেব : পৃ. ৫৩

৩৩. তদেব : পৃ. ৬৯

৩৪. পালিত, দিব্যেন্দু : অন্তর্ধান, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫১২

৩৫. তদেব : পৃ. ৫৪৯

৩৬. তদেব : পৃ. ৫২০

৩৭. তদেব : পৃ. ৫১৮

৩৮. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪২২

৩৯. তদেব : পৃ. ৪৪২

৪০. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫৩

৪১. তদেব : পৃ. ৬৯

৪২. তদেব : পৃ. ৬৮

৪৩. তদেব : পৃ. ৫০

৪৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৬২

৪৫. পালিত, দিব্যেন্দু : চরিত্র, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৭৬

৪৬. পালিত, দিব্যেন্দু : ঘরবাড়ি, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৩২

৪৭. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৩

৪৮. পালিত, দিব্যেন্দু : স্বপ্নের ভিতর, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৩৮৮

৪৯. তদেব : পৃ. ৪৩৪